বিয়ে সংকলন

সংকলনেঃ ইবরাহীম খলিলুল্লাহ

সূচীপত্র

ভালোবাসার স্বভাব, ভালোবাসার অভাব

১।

কাজ থেকে ফিরছিলাম। ট্রেন স্টেশন থেকে বেরোবার পথে বেশিরভাগ মানুষ ডানদিকে চলে গেল, বামদিকে আমার সামনে কেবল এক মহিলা ছাড়া আর কেউ নেই। আমি সাধারনত খুব দ্রুত হাঁটি, এই মহিলা বুঝলাম আমার চেয়েও দ্রুত হাঁটছেন, কারণ পেছন থেকে কেবল তাঁর ঋজু দেহখানা দেখতে পাচ্ছি, চেহারা দেখছিনা। দু'জনেই বাঁয়ে মোড় ঘুরলাম। দেখি মহিলার হাঁটার গতি আরো বেড়ে গেল। রাস্তার পাশে একখানা লাল গাড়ী, স্টিয়ারিং উইলে এক বৃদ্ধ দাদামশায় উৎসুক ভঙ্গিতে বসে আছেন, মুখের হাতের চামড়ায় কুঁচকানো দেখে বোঝা যাচ্ছে ভালোই বয়স হয়েছে। মহিলা দ্রুত হেঁটে গাড়িতে ওঠার পর খেয়াল করলাম তিনি হলেন দাদামশায়ের স্ত্রী, মাথার সব চুলই শ্বেতবর্ণ ধারণ করেছে, আজন্ম স্নো ক্রীমে লালিত মুখখানাতেও ভাঁজ পড়েছে ভালই। দাদীমা গিয়ে বসতেই দাদামশায় একগাল হাসি দিয়ে গাড়ীতে স্টার্ট দিলেন, দাদীর মুখ থেকে সারাদিনের ক্লান্তির সব চিহ্ন উবে গেল। তাঁদের এই চৌম্বকীয় ভালোবাসার দৃশ্যের সাক্ষীটির মনটা পরম মমতায় ভরে উঠল। আজকের যুগের দেহসর্বস্ব ভালোবাসার ভিড়ে এমন নিখাদ ভালোবাসার গভীরতা পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ কি প্রতিদিন মেলে?

২।

কেউ ভাবেনি বিয়েটা টিকবে। মেয়েটি নিজেও না। স্বামী প্রবাসী, বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে কিন্তু স্ত্রীকে নিতে পারছেনা। মেয়েটি অত্যন্ত মেধাবী, যতদিনে স্বামীর তাকে নেয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হোল ততদিনে সে লেখাপড়ার মধ্যাবস্থায়, পড়াশোনা শেষ না করে সে কিছুতেই যাবেনা। স্বামী বলতে শুরু করল সে আবার বিয়ে করবে, মেয়েটি বলল, 'তাহলে আমি আর গিয়ে কি করব?' স্বামী ছুটিতে দেশে এসেছে, স্ত্রী যাবেনা। আত্মীয়স্বজন ভাবছে এই বিয়ে কিছুতেই টিকবেনা। এমন এক অবস্থায় ওরা দু'জনেই এলো আমার কাছে। মেয়েটিকে বললাম সবকিছু ছেড়ে চলে যাও।

সে হতবাক হয়ে বলল, 'আপনি একজন শিক্ষক হয়ে কি করে এমন একটি কথা বলতে পারলেন?'

বললাম, ‘শোন, শিক্ষক বলেই এ’কথা বলতে পারলাম। তোমার মেধা আছে। এই মেধা কেউ কেড়ে নিতে পারবেনা। আমি জানি একদিন তোমার লেখাপড়া ডিগ্রী ভবিষ্যত সব হবে। কিন্তু সেদিন এই সম্পর্কের জন্য তোমার আফসোস হবে, ‘যদি আমি চেষ্টা করতাম, হয়ত আমার সংসারটা টিকত!’

সে বলল, ‘কিন্তু সে তো বলছে সে আবার বিয়ে করবে, তাহলে ওর সাথে গিয়ে আমার লাভ কি?’

বললাম, ‘রাগের মাথায় মানুষ অনেক কথাই বলে। তুমি পাশে নেই তাই তোমাকে ভয় দেখিয়ে সাথে নিতে চায়। এগুলো ভালোবাসাপ্রসূত অভিমান, বদনিয়ত নয়’।

সে আমার কথা বিশ্বাস করল। আমি আত্মীয় নই, স্বজন নই, নই কিছুই। কিন্তু সে আমার কথার ওপর ভরসা করে এত সাধের লেখাপড়া অসম্পূর্ন রেখে চলে গেল প্রবাসে, স্বামীর সাথে থাকার জন্য।

ক’দিন আগে সে জানালো সে দেশের এক বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ভর্তি পেয়েছে। ফেসবুক প্রোফাইলে ওর ফুটফুটে সন্তান দু’টির মুখচ্ছবি সাক্ষ্য দিচ্ছে আজ সে সব পেয়েছে- স্বামী, সন্তান, শিক্ষার সুযোগ, সাফল্য, সুখ। সামান্য একটু ধৈর্য্য, সামান্য একটু অপেক্ষা, অনেক অনেক বিশ্বাস- এটাই ওর সাফল্যের চাবিকাঠি ছিল। কিন্তু আমরা অনেকেই এই ধৈর্য্যটুকু রাখতে পারিনা, যা চাই তার জন্য অপেক্ষা করতে রাজী থাকিনা, ভাবতে পারিনা যে অনেকসময় ভালোটুকু পাওয়া যায় খারাপের পরেই- এ’টুকু সময় স্থির থাকতে পারলে হয়ত আমরা অনেক কিছুই অর্জন করতে পারতাম যা অনেকে আজীবন সাধনা করেও অর্জন করতে পারেনা।

রেহনুমা বিনত আনিস

বিয়ে সংক্রান্ত প্রখ্যাত 'আলিমদের বইগুলি [ফুটপাথে/ট্রেনে বিক্রিত বইগুলি নয়] পড়লে দেখবেন তাঁরা সকলেই লিখা শুরু করেছেন "Choosing the right Spouse" বা এই জাতীয় কোন শিরোনাম দিয়ে। তাঁরা পারতেন সরাসরি বিবাহিত জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নির্দেশনামূলক কোন লিখা দিয়ে কিংবা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব সম্পর্কে লিখে। কিন্তু তা না করে স্পাউস চুজ করার বিধিবিধানকে টপিক হিসেবে সিলেক্ট করলেন কেন ?

শুধু বাহ্যিক ইবাদাহ ঠিক থাকাই স্পাউস চুজ করার একমাত্র ক্রাইটেরিয়া নয়, ছেলেদের ক্ষেত্রেতো নয়ই যেটা রাসূলুল্লাহ (সা) ও বলে দিয়েছেন এর সাথে "চরিত্র" যুক্ত করে। হ্যাঁ, দ্বীনদারিতা অবশ্যই দেখতে হবে। তবে সেই সাথে একজন ছেলে/মেয়ের যথেষ্ট "বুঝদার" হতে হবে। বুঝদার মানে এই না যে তাকে রকেট সায়েন্স বুঝতে হবে বরং তাদের চলার পথে যে সুসময়-দুঃসময় আসবে তাতে জীবনসঙ্গীর মেজাজ বুঝে তাকে অবলম্বন দেওয়ার মত দৃঢ়তা এবং সাহসও থাকা চাই। এই গুণ কেউ মায়ের গর্ভ থেকে নিয়ে জন্মায় না, যারা পারে তারা তা অর্জন করেই নেয়, হয় বিয়ের আগে নয়ত পরে। এই "সাপোর্টিভ" হওয়াটা যে একজন পুরুষ/স্ত্রীর জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা ভাষায় অবর্ণনীয়।

আজ স্ত্রীর সাথে আলোচনা করছিলাম এটা নিয়ে। ও বলল, "দেখো, অনেক শিক্ষিত ছেলেই কিন্তু চায় অল্প শিক্ষিত/অবুঝদার মেয়ে বিয়ে করতে যেন তার চেয়ে কম বুঝে কিংবা সে যা বুঝাবে স্ত্রীও তাই বুঝবে। কিন্তু কোন বিপদের সময় যখন কারও সাজেশন দরকার তখন তারাই আবার ঘরের বাইরে এডভাইজার খুঁজে ফিরে, এজন্য অনেক সময় ঘরের গোপন কথাও বাইরে লোকের সাথে শেয়ার করতে হয় অথচ তার স্ত্রী তখন নিশ্চুপ। কিন্তু তার স্ত্রীকে যদি সে সেভাবে সাপোর্ট দিয়ে ডিসিসিভ করতে পারত/তেমন কোন স্ত্রী চুজ করত তবে আজ ঘরের বাইরে গিয়ে কান্নাকাটি করতে হত না। তারা মুখে না বললেও মনে মনে ঠিকই অনুভব করে একজন সাপোর্টিভ স্ত্রীর গুরুত্ব"।

ব্যক্তিগতভাবে বিয়ের পর আমি এটি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। যখনই আমার মনে হয়েছে কোন একটি বিষয়ে আমি সন্দিহান তখনই নিঃসংকোচে আমার স্ত্রীকে বলতে পেরেছি। যখনই মনে হয়েছে কোন একটা ভাল কাজে কোনভাবে অংশ নেওয়া দরকার তখন সেই-ই আগ বাড়িয়ে

আমার জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছে, বিয়ের পর আমরা একে অপরকে ভাল কাজে সংযুক্ত করার জন্য যতটুকু সাপোর্ট দেওয়া দরকার দিয়েছি। কোন ভুল বোঝাবুঝি কিংবা "ডমিনেশন" হারিয়ে যাওয়ার ভয় আমাদেরকে স্পর্শ করেনি। যে মানুষটার হাত ধরে বাকি জীবন থাকবেন তার সাথে কীসের ডমিনেশন খাটান ? আমার গুরু ইয়াওয়ার বেগ এর কথা আমি সারাজীবন ভুলব না-"স্ত্রীর সাথে কখনো জেতা/হারা খেলবেন না। কারণ, তার সাথে আপনি হারলেন তো হারলেনই, জিতলেও হারলেন।"

শুধু বাহ্যিক ইবাদাহ ঠিক থাকলেই এই "সাপোর্টিভ" গুণটা অর্জন করা যায় না, এর জন্য সচেতন প্রচেষ্টা জরুরি। আর যখন স্বামী-স্ত্রীর কারও/উভয়ের মাঝে এই সাপোর্টিভনেস থাকবে তখন তাদের পরবর্তী কর্তব্য হল একে অপরকে এর জন্য থ্যাঙ্কস দেওয়া, দূয়া করা, ভালোবেসে দুটো কথা প্রকাশ করা, বারবার নিজের জীবনে তার গুরুত্বের কথা তুলে ধরা। ফ্রেণ্ড কিংবা কলিগদেরকে হাই/হ্যালো সহ যাবতীয় আজাইরা মেসেজ না দিয়ে স্বামী/স্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে একটা মেসেজ দিন, নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করুন। বন্ধু বান্ধব আপনার ভালবাসার মুখাপেক্ষী নয়, আপনার জীবনসঙ্গী মুখাপেক্ষী। তাকে তার প্রাপ্য দিন, আপনিও আপনার প্রাপ্য পাবেন।

শেষ কথাঃ ফেসবুকে "আর্লি ম্যারেজ ক্যাম্পেইন" এর নামে ফালতু, থার্ড ক্লাস কাজ না করে অবিবাহিতদের উচিত বিয়ে নিয়ে যথেষ্ট লেখাপড়া করা, ছেলে/মেয়েদের সাইকোলজি নিয়ে 'আলিমদের কথাগুলি শোনা [যদিও এটি প্র্যাক্টিকাল বিষয় কিন্তু থিওরিটিক্যাল নলেজ প্র্যাক্টিকাল বুঝতে অনেক কাজে দেয়], সত্যিকার "ভালবাসা" আমৃত্যু ধরে রাখার জন্য যে আর্ট জানা দরকার তা রপ্ত করার মানসিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করা। আর্লি ম্যরেজ করলেই আপনি হ্যাপি হবেন তার নিশ্চয়তা নাই, তবে সংসার জীবনের আর্ট জানা থাকলে ইনশাআল্লাহ আপনাদের ভালবাসায় কেউ/কিছু ফাটল ধরাতে পারবে না।

কবির আনোয়ার

দাম্পত্যজীবন, অজ্ঞতা ও পরিণাম

কিছু দিন আগে আমার এক প্রিয় তালিবে ইলম দেখা করতে এসে বললো, হুযূর, আগামী পরশু আমার বিবাহ। চমকে উঠে তাকালাম। বড় ‘বে-চারা’ মনে হলো। কারণ আমিও একদিন বড় অপ্রস্তুত অবস্থায় জেনেছিলাম, আগামীকাল আমার বিবাহ! ভিতর থেকে হামদরদি উথলে উঠলো। ইচ্ছে হলো তাকে কিছু বলি, যিন্দেগির এই নতুন রাস্তায় চলার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু পাথেয়, আল্লাহর তাওফীকে তাকে দান করি। আল্লাহর তাওফীক ছাড়া আমরা কেই বা কী করতে পারি!

তো তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বিবাহের জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছো? বড় ভোলাভালা নও জোয়ান! সরলভাবে বললো, আমার কিছু করতে হয়নি, সব প্রস্তুতি আববা -আম্মাই নিয়েছেন। কেনা-কাটা প্রায় হয়ে গেছে, শুধু বিয়ের শাড়ীটা বাকি।

অবাক হলাম না, তবে দুঃখিত হলাম, আমার এই প্রিয় তালিবে ইলম এখন একজন যিম্মাদার আলিমে দ্বীন। দীর্ঘ কয়েক বছর আমাদের ছোহবতে ছিলো, তার কাছে বিবাহের প্রস্তুতি মানে হলো জিনিসপত্র এবং বিয়ের শাড়ী! তাহলে অন্যদের অবস্থা কী?!

বড় মায়া লাগলো; বললাম, দেখো, মানুষ যে কোন কাজ করতে চায়, প্রথমে সে ঐ বিষয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করে। কাজটির হাকীকত ও উদ্দেশ্য কী? কাজটি আঞ্জাম দেয়ার সঠিক পন্থা কী? শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কী কী সমস্যা হতে পারে, সেগুলোর সমাধান কী? এগুলো জেনে নেয়। এজন্য দস্তুর মত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার আয়োজন আছে, এমনকি বাস্তব প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা আছে।

অথচ জীবনের সবচে’ কাঠিন ও জটিল অধ্যায়ে মানুষ প্রবেশ করে, বরং বলতে পারো ঝাঁপ দেয়, কিছু না শিখে, না জেনে এবং না বুঝে একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায়। ফল কী হতে পারে?! কী হয়?! অন্যদের কথা থাক, চোখের সামনে আমার ক’জন ছাত্রের ঘর ভেঙ্গে গেলো! একজনের তো এমনকি দু’জন সন্তানসহ। কিংবা ঘর হয়ত টিকে আছে, কিন্তু শান্তি নেই। স্বাভাবিক শান্তি হয়ত বজায় আছে, কিন্তু বিবাহ যে দুনিয়ার বুকে মানবের জন্য আল্লাহর দেয়া এক জান্নাতি নেয়ামত, সুকূন ও সাকীনাহ, সে খবর তারা পায়নি, শুধু অজ্ঞতার কারণে, শুধু শিক্ষার অভাবে।

আশ্চর্য, মা-বাবা সন্তানকে কত বিষয়ে কত উপদেশ দান করেন; উস্তাদ কত কিছু শিক্ষা দেন, নছীহত করেন, কিন্তু জীবনের সবচে' কঠিন ও জটিল বিষয়টি কেন যেন তারা সযত্নে এড়িয়ে যান!

তাকে বললাম, যদিও তুমি এ উদ্দেশ্যে আসোনি তবু তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই, যা ইনশাআল্লাহ আগামী জীবনে তোমার কাজে আসবে।

খুব জযবা ছিলো, অবেগের তোড় ছিলো, 'দিল কো নিচোড় ক্যর', বাংলায় যদি বলি তাহলে বলবো, হৃদয় নিংড়ে, কিন্তু দিল কো নিচোড়না-এর ভাব হৃদয় নিংড়ানোতে আসবে কোত্থেকে! যাক, বলছিলাম, হৃদয়টাকে নিংড়ে কিছু কথা তাকে বলেছিলাম। পরে আফসোস হলো যে, কথাগুলো তো সব হাওয়ায় উড়ে গেলো, যদি বাণীবদ্ধ করে রাখা যেতো কত ভালো হতো! হয়ত আল্লাহর বহু বান্দার উপকারে আসতো। শেষে বললাম, এককাজ করো, এ কথাগগুলোর খোলাছা কাগজে লিখে আমাকে দেখিও।

আগামী পরশুর বিয়ের খবর দিয়ে ছেলেটা সেই যে গেলো, তিন বছরে আর দেখা নেই! দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন সময় দরসেও আমি অনেক কথা বলেছি। 'সবচে' বেশী বলেছি আমার নূরিয়ার জীবনের প্রিয় ছাত্র (বর্তমানের হাতিয়ার হুযূর) মাওলানা আশরাফ হালীমীকে, আশা করি তিনি সাক্ষ্য দেবেন, অনেকবার বলেছেন, আমার কথাগুলো তার জীবনে বে-হদ উপকারে এসেছে। আরো অনেকে বলেছে, কিন্তু কথাগুলো কেউ 'কলমবন্দ' করেনি।

তো এখন এই উপলক্ষকে কেন্দ্র করে তোমাদের মজলিসে ঐ কথাগুলো আবার বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আফসোস, সেই আবেগ ও জযবা তো এখন নেই যা ঐ প্রিয় তালিবে ইলমকে বলার সময় ছিলো। আবেগভরা দিলের কথা তো রসভরা ইক্ষু, আর শুধু চিন্তা থেকে বলা কথা হলো রস নিংড়ে নেয়া ইক্ষুর ছোবা! তবু কিছু না কিছু ফায়দা তো ইনশাআল্লাহ হবে।

আমি আমার প্রিয় ছাত্রটিকে বলেছিলাম, এখন তোমার জীবনের এই যে নতুন অধ্যায় শুরু হচ্ছে উর্দূতে এটাকে বলে ইযদিওয়াজী যিন্দেগী, বাংলায় বলে দাম্পত্য জীবন, অর্থাৎ এটা জীবন ও যিন্দেগির খুবই এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ, শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং অত্যন্ত জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ। এটা তোমাকে ঘাবড়ে দেয়ার জন্য বলছি না; প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ ও পাথেয় সংগ্রহ করার

জন্য বলছি, যাতে পূর্ণ আস্থা ও সাহসের সঙ্গে তুমি তোমার এই নতুন জীবন শুরু করতে পারো। আল্লাহ যদি সাহায্য করেন তাহলে সবই সহজ।

এটা যে শুধু তোমার ক্ষেত্রে হচ্ছে তা নয়! আমার জীবনেও হয়েছে, আমার মা-বাবার জীবনেও হয়েছে! তোমার মা-বাবাও একদিন এ জীবন শুরু করেছিলেন। যদি সহজ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকে তাহলে তোমার মাকে, বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো, কীভাবে তারা এ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছেন? জীবনের শুরুতে তারা কী ভেবেছিলেন, কী চেয়েছিলেন, কী পেয়েছেন?

কখন কী সমস্যা হয়েছে, সেগুলো কীভাবে সমাধান করেছেন। এই জীবনের শুরুতে তোমার প্রতি তাদের কী উপদেশ? এধরনের সহজ আন্তরিক আলোচনায় সংসার জীবনের পথচলা অনেক সহজ হয়ে যায়। অবশ্য সব মা-বাবার সঙ্গে সব সন্তানের এমন সহজ সম্পর্ক থাকে না, তবে থাকা উচিত। জীবনের যে কোন সমস্যার সমাধানের জন্য সন্তান মা-বাবার কাছেই আসবে, মা-বাবাকেই নিরাপদ আশ্রয় মনে করবে, বন্ধুবান্ধবকে নয়। কঠিন সমস্যার মুখে একজন অপরিপক্ক বন্ধু কীভাবে সঠিক পথ দেখাতে পারে! কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাই ঘটে। সন্তান মা-বাবাকে ভয় করে, হয়ত কোন জটিলতায় পড়েছে; তখন তাদের প্রথম চেষ্টা হয় যে, মা-বাবা যেন জানতে না পারে, কারণ তাদের কানে গেলে সর্বনাশ! ছেলে তার বন্ধুর শরণাপন্ন হয়, মেয়ে তার বান্ধবীর কাছে বলে, তারা তাদের মত করে পরামর্শ দেয়। ফলে অবস্থা আরো গুরুতর হয়।

অতীতে যাই ছিলো, এখন তো অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, মা-বাবার জন্য সন্তানের বন্ধু হওয়া। বিপদে সমস্যায় সন্তানকে তিরস্কার পরে করা, আগে তার পাশে দাঁড়ানো। তাহলে সন্তান আরো বড় অন্যায় করা থেকে এবং আরো গুরুতর অবস্থায় পড়া থেকে বেঁচে যায়। কিন্তু এখন অবস্থা হলো, সন্তান মা-বাবাকে ভয় করে, বন্ধুকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল মনে করে। আমার ছেলেকে আমি এটা বোঝাতে চেয়েছি এবং আশা করি, কিছুটা বোঝাতে পেরেছি। অনেক সমস্যা থেকে সে রক্ষা পেয়েছে, কারণ সবার আগে সে আমার কাছে এসেছে, আর আমি বলেছি, ভয় নেই, আমি তোমার পাশে আছি। আগে তাকে সাহায্য করেছি, তারপর প্রয়োজনে দরদের সঙ্গে তিরস্কার করেছি, বা শিক্ষা দিয়েছি। বন্ধুর কাছে আগে পাওয়া যায় সাহায্য, মা-বাবার কাছ থেকে আগে আসে তিরস্কার। তাই সন্তান সমস্যায় পড়ে মা-বাবার কাছে আসে না, বন্ধুর কাছে আসে। এভাবে নিজের কারণেই সবচে’ কাছের হয়েও মা-বাবা হয়ে যায় দূরের, আর দূরের হয়েও বন্ধু হয়ে যায়

কাছের। সন্তানের সমস্যা বন্ধু জানে সবার আগে। মা-বাবা জানে সবার পরে, পানি যখন মাথার উপর দিয়ে চলে যায় তখন।

তো আমি আশা করছি, জীবনের অন্যসকল ক্ষেত্রে যেমন তেমনি, আল্লাহ না করুন দাম্পত্যজীবনে যদি কোন রকম সমস্যার সম্মুখীন হয় তাহলে সন্তান সবার আগে আমার কাছে আসবে, তার মায়ের কাছে আসবে, আমাদের উপদেশ, পরামর্শ নেবে।

আলহামদু লিল্লাহ, সেই রকমের সহজ অন্তরঙ্গ সম্পর্কই সন্তানের সঙ্গে আমার, আমাদের।

আমার প্রিয় ছাত্রটিকে বললাম, কথা অন্য দিকে চলে গেছে, তো এই প্রসঙ্গে তোমাকে একটি আগাম নছীহত করি; আজ তোমরা স্বামী-স্ত্রী, দু'দিন পরেই হয়ে যাবে, মা এবং বাবা। সেটা তো জীবনের আরো কঠিন, আরো জটিল অধ্যায়। আমি প্রায় বলে থাকি, প্রাকৃতিক নিয়মে মা-বাবা হয়ে যাওয়া খুব সহজ। কিন্তু আদর্শ মা-বাবা হওয়ার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ শিক্ষা ও দীক্ষা। তো তোমরা দু'জন জীবনের শুরু থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করো যে, একটি মেয়ে কীভাবে একজন আদর্শ মা হতে পারে এবং একটি ছেলে কীভাবে একজন আদর্শ বাবা হতে পারে! আগে বলেছিলাম একটি নছীহত, এখন বলছি দু'টি নছীহত।

সন্তানের সামনে কখনো তার মাকে অসম্মান করো না। তোমাকে মনে রাখতে হবে, সে তোমার স্ত্রী, কিন্তু তোমার সন্তানের মা, তোমার চেয়েও অধিক শ্রদ্ধার পাত্রী। সন্তান যেন কখনো, কখনোই মা-বাবাকে ঝগড়া-বিবাদ করতে না দেখে। এ নছীহত আমি তোমাকে করছি, আল্লাহর শোকর নিজে আমল করে। আমার বড় সন্তানের বয়স ত্রিশ বছর, এর মধ্যে কখনো সে আমাদের বিবাদ করতে এমনকি তর্ক করতেও দেখেনি। দ্বিতীয়ত তোমরা উভয়ে সন্তানের বন্ধু হওয়ার চেষ্টা করো, এমন বন্ধু যাকে নিজের মনের কথা, সব কথা নিঃসঙ্কোচে জানাতে পারে।

আগের কথায় ফিরে আসি; আগামীপরশু তোমার বিবাহ। তার মানে, আজ তুমি নিছক একটি যুবক ছেলে, অথচ আগামী পরশু হয়ে যাচ্ছো, একজন দায়িত্ববান স্বামী। কত বিরাট পার্থক্য তোমার আজকের এবং আগামী পরশুর জীবনের মধ্যে। বিষয়টি তোমাকে বুঝতে হবে। কেন তুমি বিবাহ করছো? বিবাহের উদ্দেশ্য কী? দেখো, আমাদের দেশে পারিবারিক পর্যায়ে একটা নিন্দনীয় মানসিকতা হলো, সংসারের প্রয়োজনে, আরো খোলামেলা যদি বলি, কাজের মানুষের প্রয়োজনে ছেলেকে বিয়ে করানো। সবাই যে এমন করে তা নয়, তবে এটা প্রবলভাবে ছিলো, এখনো কিছু

আছে। আমি নিজে সাক্ষী, আমার একজন মুহতারাম তাঁর মেয়েকে বিয়ে দিলেন, বিয়ে হওয়ামাত্র ছেলের বাবা স্বমূর্তি ধারণ করে বলতে লাগলেন, আর দেরী করা যাবে না, তাড়াতাড়ি মেয়ে বিদায় করেন। মেয়ের মা ও বাবা তো হতবাক!

মেয়ে বিদায় হলো। শশুরবাড়ীতে রাত পোহালো, আর পুত্রবধুর সামনে কাপড়ের স্তুপ নিক্ষেপ করে শাশুড়ী আদেশ করলেন, কাপড়ে সাবান লাগাও, দেখি, মায়ের বাড়ী থেকে কেমন কাজ শিখে এসেছো!

আমার এক ছাত্রের কথা, বিয়ের প্রয়োজন। কেন? কারণ মা-বাবার খেদমত করার কেউ নেই।

এটা কিন্তু বিবাহের উদ্দেশ্য বা মাকছাদ হতে পারে না। মা-বাবার খেদমত মূলত তোমার দায়িত্ব। এখন সে যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তোমার সাথে এতে শরীক হয়, তবে সেটা তোমাদের উভয়ের জন্য সৌভাগ্যের কারণ হতে পারে। দেখো, আল্লাহ চাহে তো অচিরেই আমাদেরও ঘরে পুত্রবধু আসবে। আমরা আমাদের না দেখা সেই ছোট্ট মেয়েটির প্রতীক্ষায় আছি। কিন্তু আমি আমার পুত্রকে অবশ্যই বলবো, বিবাহের উদ্দেশ্য মা-বাবার খেদমত করা হতে পারে না।

আমি দু'আ করি, তোমার মা-বাবা তোমার যেমন, তেমনি তোমার স্ত্রীরও যেন মেহেরবান মা-বাবা হতে পারেন। আমার দুই মেয়ের শশুর, দু'জনই এখন জান্নাতবাসী (ইনশাআল্লাহ)। আল্লাহর কাছে আমার সাক্ষ্য এই যে, সত্যি সত্যি তারা আমার মেয়েদু'টির 'বাবা' ছিলেন। আমার ছোট মেয়ের শশুর বড় আলিম ছিলেন, তাঁকে আমার একটি বই হাদিয়া দিয়েছিলাম এভাবে, 'সাফফানার আববুর পক্ষ হতে সাফফানার আববাকে'। তিনি খুশী হয়ে অনেক দু'আ করেছিলেন, আর বলেছিলেন, 'আপনি তো এই ছোট্ট একটি বাক্যে সম্পর্কের মহামূল্যবান এক দর্শন তুলে ধরেছেন!

আমার বড় মেয়ের অবস্থা হলো, মায়ের বাড়ী থেকে যাওয়ার সময় সে কাঁদে না, কাঁদে 'আম্মার' বাড়ী থেকে আসার সময়।

দুআ' করি, আমার দেশের প্রতিটি মেয়ে যেন মা-বাবার ঘর থেকে এমন মা-বাবার ঘরে প্রবেশ করতে পারে। আর তুমি দু'আ করো, আমরা দু'জন যেন আমাদের অনাগত মেয়েটির জন্য তেমন মা-বাবাই হতে পারি।

তো বলছিলাম বিবাহের উদ্দেশ্যের কথা। বৈধ উপায়ে স্ত্রীপরিচয়ে কাউকে ভোগ করা, এটাও বিবাহের উদ্দেশ্য বা মাকছাদ হতে পারে না।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে বলা হয় শরীকে হায়াত, জীবনসঙ্গী এবং জীবনসঙ্গিনী। বস্তুত এই শব্দটির মধ্যেই দাম্পত্য জীবনের সুমহান উদ্দেশ্যটি নিহিত রয়েছে। আর যদি কোরআনের ভাষায় বলি তাহলে বিবাহের উদ্দেশ্য হল, তারা তোমাদের পরিচ্ছদ, তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।

তুমি তো কোরআন বোঝো। ভেবে দেখো, দাম্পত্য-সম্পর্কের কী গভীর তাৎপর্য এখানে নিহিত!

পেয়ারা হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিবাহ হচ্ছে আমার সুন্নত। আর বলেছেন, যে আমার সুন্নতের প্রতি বিমুখ হবে সে আমার উম্মতভুক্ত নয়।

বিবাহ নবীর সুন্নত! সুতরাং সহজেই বোঝা যায়, বিরাট ও মহান কোন মাকছাদ রয়েছে এর পিছনে।

বিবাহের আসল মাকছাদ বা উদ্দেশ্য হলো স্বামী ও স্ত্রী- এই পরিচয়ে একটি নতুন পরিবার গঠন করা এবং মা ও বাবা- এই পরিচয়ে সন্তান লাভ করা। তারপর উত্তম লালন-পালন এবং আদর্শ শিক্ষা-দীক্ষা ও তারবিয়াতের মাধ্যমে নেক সন্তানরূপে গড়ে তুলে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করা, যাতে নস্লে ইনসানি বা মানববংশ কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর পছন্দমত আগে বাড়তে থাকে।

এটাই হলো বিবাহের আসল উদ্দেশ্য; অন্য যা কিছু আছে তা সব পার্শ্ব-উদ্দেশ্য। তো এখনই তুমি নিয়ত ঠিক করে নাও যে, কেন কী উদ্দেশ্যে বিবাহ করবে। উদ্দেশ্য যদি ঠিক হয়ে যায় তাহলে দেখতে পাবে, আল্লাহ চাহে তো এখনই তোমার ভিতরে কত সুন্দর পরিবর্তন আসছে! কী আশ্চর্য এক পরিপূর্ণতা নিজের মধ্যে অনুভূত হচ্ছে! আগামী জীবনের সকল দায়দায়িত্ব পালন করার জন্য গায়ব থেকে তুমি আত্মিক শক্তি লাভ করছো। আল্লাহ তাওফীক দান করেন।

এবার আসো জীবনেরবাস্তবতার কথা বলি, এতদিন তোমার জীবনে ছিলেন শুধু তোমার মা, যিনি তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন, প্রসববেদনা ভোগ করেছেন। নিজেকে তিলে তিলে ক্ষয় করে তোমাকে প্রতিপালন করেছেন। এতদিন তোমার উপর ছিলো তাঁর অখন্ড অধিকার। হঠাৎ তিনি দেখছেন, তাঁর আদরের ধন, তাঁর আঁচলের রত্ন পুত্রের জীবনে স্ত্রীপরিচয়ে অন্য এক নারীর প্রবেশ (অনুপ্রবেশ?) ঘটেছে! এভাবে পুত্রের উপর তার অখন্ড অধিকার খন্ডিত হতে চলেছে। যে

পুত্র ছিলো এতদিন তাঁর একক অবলম্বন, এখন সে হতে চলেছে অন্য এক নারীর অবলম্বন। এ বাস্তবতা না তিনি অস্বীকার করতে পারছেন, না মেনে নিতে পারছেন। সংসারে প্রত্যেক মায়ের জীবনে এ কঠিন সময়টি আসে। এমন এক অর্ন্তজ্বালা শুরু হয় যা শুধু তিনি নিজেই ভোগ করেন, কাউকে বোঝাতে পারেন না, এমনকি এতদিনের আদরের ধন পুত্রকেও না। ফলে সামান্য সামান্য কারণে, এমনকি অকারণেও তিনি খুব সংবেদনশীল হয়ে পড়েন; তাঁর অনুভূতি আহত হয়। এমন সময় ছেলে (এবং তার স্ত্রী অজ্ঞতা, অনভিজ্ঞতা ও অপিরপক্কতার কারণে) যদি অসঙ্গত কিছু বলে বা করে বসে তাহলে তো মায়ের মনে কষ্টের শেষ থাকে না। প্রসববেদনা থেকে শুরু করে প্রতিপালনের সব কষ্ট একসঙ্গে মনে পড়ে যায়।

আম্মার কাছে শুনেছি, গ্রামের এক মা তার পুত্রবধুকে বলেছিলেন, 'ততা ফানি আমি খাইছিলাম, না তুই খাইছিলি?'

তখনকার যুগে প্রসবপরবর্তী বেশ কিছু দিন মা ও শিশুর স্বাস্থ্যগত কল্যাণ চিন্তা করে মাকে গরম পানি খেতে দেয়া হতো, ঠান্ডা পানি দেয়া হতো না।

তো কথাটা কিন্তু নির্মম। আমার জন্য 'তাতানো পানি' আমার মা খেয়েছেন, আমার সব আবর্জনা আমার মা পরিস্কার করেছেন। নিজের জীবন তিলে তিলে ক্ষয় করে তিনি আমাকে বড় করেছেন, উপযুক্ত করেছেন। সেই সব কষ্টের সুফল হঠাৎ করে অন্য একটি মেয়ে এসে অধিকার করে বসেছে। তখন সব হারানোর একটা বেদনা তাকে কুরে কুরে খায়। তো তোমার মায়ের অন্তরেও এরকম অনুভূতি হওয়া স্বাভাবিক। মায়ের মনের এই কষ্টের উপশম, এই বেদনার সান্ত্বনা তোমাকেই চিন্তা করতে হবে।

মায়ের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে আসে বাবার কথা, তারপর ভাই-বোনদের কথা। (এসম্পর্কেও ছাত্রটিকে বিশদভাবে বলেছিলাম।)

তৃতীয়ত তোমার স্ত্রী। যদিও তৃতীয় বলছি, কিন্তু বাস্তবে এটাই হলো সবচে' গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচে' নাযুক। তবে এটা থাকবে তোমার দিলে, তোমার অন্তরে। মা-বাবার সামনে মুখের কথায় বা আচরণে এটা প্রকাশ করা প্রজ্ঞার পরিচায়ক হবে না।

কেন বলছি স্ত্রীর বিষয়টি সবচে’ নাযুক? তার আগে আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দাও; কোন বিবাহে কোন ছেলেকে কাঁদতে দেখেছো?! কোন ছেলের মা-বাবাকে বিষণ্ন দেখেছো?! দেখোনি; (হয়তো ব্যতিক্রম এক দুইটি ঘটনা থাকতে পারে। কিন্তু সাধারণ অবস্থা এটিই, এদের কেউ কাঁদে না।) কেন? কারণ বিবাহের মাধ্যমে ছেলে কিছু হারায় না, ছেলের মা-বাবা কিছু হারায় না, বরং অর্জন করে। তাই তাদের মুখে থাকে অর্জনের হাসি এবং প্রাপ্তির তৃপ্তি।

বিবাহের আসরে কাঁদে শুধু মেয়ে, আর মেয়ের মা-বাবা। কেন কাঁদে একটি মেয়ে? কারণ তাকে সবকিছু হারাতে হয়, সবকিছু ত্যাগ করতে হয়। মা-বাবাকে ছেড়ে আসতে হয়, শৈশবের সব স্মৃতি তাকে মুছে ফেলতে হয়। একটি ছোট্ট মেয়ের জীবনে এটি অনেক বড় আঘাত। এ যেন একটি ছোট্ট গাছের চারাকে শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলে বহু দূরে ভিন্ন পরিবেশে নতুন মাটিতে এনে রোপণ করা। বাকি জীবন তাকে এই মাটি থেকেই রস আহরণ করে বেঁচে থাকতে হবে।

হিন্দিতে বলে, ‘আওর্‌যত কী ডোলী যাহা উত্যরতী হ্যয়, উসকী আর্থী ওহীঁ সে উঠতি হ্যয়।’ অর্থাৎ মেয়েদের পালকি যেখানে গিয়ে নামে, সেখান থেকেই তার জানাযা ওঠে।

কত বড় নির্মম সত্য! তো তোমার স্ত্রীরূপে তোমার ঘরে আসা এই ছোট্ট মেয়েটির যখমি দিলে তাসাল্লির মরহম তোমাকেই রাখতে হবে। একমাটি থেকে উপড়ে এনে আরেক মাটিতে রোপণ করা একটি চারাগাছ থেকে দু’দিন পরেই ফল দাবী করা কতটা নিষ্ঠুরতা! ফল পেতে হলে তোমাকে ধৈর্য ধরতে হবে। চারা গাছটির পরিচর্যা করতে হবে, সকাল-সন্ধ্যা তার গোড়ায় পানি দিতে হবে। ধীরে ধীরে শিকড় যখন মাটিতে বসবে এবং মাটি থেকে রস সংগ্রহ করার উপযুক্ত হবে, তখন তোমাকে ফল চাইতে হবে না; সজীব বৃক্ষ নিজে থেকেই ফল দিতে শুরু করবে।

কত আফসোসের বিষয়, দাম্পত্য জীবনের শুরুতে যত আদেশ-উপদেশ সব ঐ ছোট্ট মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে বর্ষিত হয়। প্রথম দিনেই তাকে শুনতে হয়, এখন থেকে তাকে স্বামীর মন জয় করতে হবে, শশুর-শাশুড়ি সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে, শশুর বাড়ীর সবার মন যুগিয়ে চলতে হবে। তার নিজের যেন কোন ‘মন’ নেই। সুতরাং সেটা জয় করারও কারো গরজ নেই।

তো মায়ের মন তোমাকেই রক্ষা করতে হবে, আবার স্ত্রীর মনোরঞ্জনও তোমাকেই করতে হবে। সবদিক তোমাকেই শামাল দিয়ে চলতে হবে। কত কঠিন দায়িত্ব! অথচ না শিক্ষাঙ্গনে, না

গৃহপ্রাঙ্গণে, কোথাও এ সম্পর্কে শিক্ষার নূন্যতম কোন ব্যবস্থা নেই। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় দু'টি অপরিপক্ক তরুণ-তরুণীকে যেন সংসার সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়া! মেয়েটিও জানে না, আজ থেকে সে আর ছোট্ট মেয়েটি নেই। সে এখন স্ত্রী হয়ে একটি অপরিচিত মানুষের জীবনে প্রবেশ করছে, যার মা আছে, বাবা আছে, ভাইবোন আছে এবং তাদের প্রতি তার স্বামীর অনেক দায়-দায়িত্ব আছে। সহানুভূতির সঙ্গে কোমলাতার সঙ্গে এই দায়িত্ববোধ কেউ তার মধ্যে জাগ্রত করে দেয়নি। এ দোষ কার!

তো আমার প্রিয় ছাত্রটিকে বলেছিলাম, কথা দ্বারা আচরণ দ্বারা তোমার মাকে তুমি বোঝাবে, মা, আমি আপনারই ছিলাম, আছি এবং থাকবো। স্ত্রী হলো আমার জীবনের নতুন প্রয়োজন; আপনি আমার প্রাণ, আপনার সঙ্গে আমার নাড়ির টান।

অন্যদিকে স্ত্রীকে বোঝাতে হবে, এই সংসার সমুদ্রে তুমি একা নও; আমি তোমার পাশে আছি। নতুন জীবনে চলার পথে আমারও অনেক কষ্ট হবে, তোমারও অনেক কষ্ট হবে। তবে সান্ত্বনা এই যে, তুমিও একা নও, আমিও একা নই। আমার পাশে তুমি আছো, তোমার পাশে আমি আছি। আমার কষ্টের সান্ত্বনা তুমি, তোমার কষ্টের সান্ত্বনা আমি। আমরা পরস্পরের কষ্ট হয়ত দূর করতে পারবো না, তবে অনুভব করতে পারবো এবং হয়ত কিছুটা লাঘব করতে পারবো।

আল্লাহর কসম, এমন কোন নারিহৃদয় নেই যা এমন কোমল সান্ত্বনায় বিগলিত হবে না।

তোমার স্ত্রীকে তুমি এভাবে বলবে, আমাদের জীবন তো আলাদা ছিলো। আমরা তো একে অপরকে চিনতামও না। আল্লাহ আমাদের কেন একত্র করেছেন জানো?! একা একা জান্নাতে যাওয়া কঠিন। আল্লাহ আমাদের একত্র করেছেন একসঙ্গে জান্নাতের পথে চলার জন্য। আমি যদি পিছিয়ে পড়ি, তুমি আমাকে টেনে নিয়ে যাবে; তুমি যদি পিছিয়ে পড়ো, আমি তোমাকে টেনে নিয়ে যাবো। তুমি সতর্ক থাকবে, আমার দ্বারা যেন কারো হক নষ্ট না হয়; আমিও সতর্ক থাকবো, তোমার দ্বারা যেন কারো প্রতি যুলুম না হয়।

প্রিয় ছাত্রটিকে আমি আরো বললাম, স্ত্রীকে বোঝানোর জন্য তার সন্তানকে সামনে আনতে হবে। অর্থাৎ তুমি তাকে বলবে, দেখো, জীবন কত গতিশীল! সবকিছু কত দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে! দু'দিন আগে আমরা শুধু যুবক-যুবতী ছিলাম, আজ হয়ে গেছি স্বামী-স্ত্রী। দু'দিন পরেই হয়ে যাবো মা-

বাবা। আমি বাবা, তুমি মা! আল্লাহর কাছে একজন মায়ের মর্যাদা কত! তোমার কদমের নীচে হবে তোমার সন্তানের জান্নাত! যেমন আমার মায়ের কদমের নীচে আমার জান্নাত। তো তোমার সন্তান কেমন হলে তুমি খুশী হবে? আমাকেও আমার মায়ের ঐরকম সন্তান হতে তুমি সাহায্য করো। আমি যদি ভুল করি, মায়ের কোন হক নষ্ট করি, মায়ের সামনে 'উফ' করি, তুমি আমাকে সাবধান করো, আমাকে সংশোধন করো। তাহলে ইনশাআল্লাহ তোমার সন্তানও তুমি যেমন চাও তেমন হবে।

প্রয়োজন হলে স্ত্রীকে মা-বাবার সামনে তিরস্কার করবে, তবে ঘরে এসে একটু আদর, একটু সোহাগ করে বোঝাতে হবে, কেন তুমি এটা করেছো?! বোঝানোর এই তরযগুলো শিখতে হবে, আর এটা দু'একদিনের বিষয় নয়, সারা জীবনের বিষয়। কিন্তু আমরা ক'জন এভাবে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন যাপন করি?! হয় মাতৃভক্তিতে স্ত্রীর প্রতি অবিচার করি, না হয়, স্ত্রীর ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে মা-বাবার দিলে আঘাত দেই, আর দুনিয়া-আখেরাত বরবাদ হয়। আমার একটা কথা মনে রেখো, মায়ের পক্ষ নিয়ে স্ত্রীর প্রতি অবিচার করা মূলত মায়ের প্রতি যুলুম, তদ্রূপ স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে মায়ের হক নষ্ট করা আসলে স্ত্রীর প্রতি যুলুম। সবকিছু হতে হবে হিকমত ও প্রজ্ঞার সঙ্গে।

একটি ঘটনা তোমাকে বলি, তোমার মত আলিমে দ্বীন নয়, সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত একজন মানুষ আমাকে বলেছেন, একবার তার মা তাকে বললেন, তোর বউ আজ তোর এত আপন হয়ে গেলো কীভাবে!

আমি বললাম, দেখো মা, তোমাকে আমি মা বলি; এই 'মা' ডাকটুকু পাওয়ার জন্য তোমাকে কত কষ্ট করতে হয়েছে! অথচ 'পরের বাড়ীর মেয়েটি'র মুখ থেকে তুমি বিনা কষ্টে 'মা' ডাক শুনতে পাও! তোমাকে যে মা বলে ডাকে সে আমার আপন হবে না কেন মা?

আরেকটা ঘটনা, এক মা তার মেয়ের শাশুড়ী সম্পর্কে বললেন, মানুষ না, মেয়েটাকে আনতে পাঠালাম, দু'টো পিঠে বানিয়ে খাওয়াবো, দিলো না, ফেরত পাঠিয়ে দিলো!

দু'দিন আগে তিনিও একই কাজ করেছিলেন, ছেলের বউকে নিতে এসেছিলো মায়ের বাড়ী থেকে। তিনি বললেন, দু'দিন পরে আমার মেয়েরা আসবে এখন তুমি গেলে কীভাবে চলবে!

ভদ্রমহিলাকে বললাম, আপনার কাজটা কি ঠিক হয়েছিলো? আপনাকে কষ্ট দেয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, সতর্ক করা উদ্দেশ্য। আল্লাহর কাছে যদি আটকা পড়েন তখন তো আপনিই বলবেন, তুমি তো হাদীছ-কোরআন পড়েছো, আমাকে সতর্ক করোনি কেন?

মোটকথা, মেয়েদেরকে তারবিয়াত করতে হবে যাতে তারা আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মা এবং আদর্শ শাশুড়ীরূপে আদর্শ জীবন যাপন করতে পারে। পুরুষ হচ্ছে কাওয়াম ও পরিচালক। সুতরাং তারবিয়াত ও পরিচালনা করা পুরুষেরই দায়িত্ব। স্ত্রী, মা ও শাশুড়ী, জীবনের এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন ধাপের জন্য ঘরে ঘরে আমরা যদি আমাদের মেয়েদের গড়ে তুলতে পারি, আদেশ দ্বারা, উপদেশ, সর্বোপরি নিজেদের আচরণ দ্বারা তাহলেই সংসার হতে পারে সুখের, শান্তির।

প্রিয় ছাত্রটিকে আরেকটি কথা বললাম, তোমার স্ত্রীর কোন আচরণ তোমার অপছন্দ হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথমে তোমাকে ভাবতে হবে, তোমার সব আচরণ কি সুন্দর, তোমার স্ত্রীর পছন্দের? তাছাড়া তোমার স্ত্রীর ভালো দিক কি কিছু নেই। সেই ভালো দিকগুলোর জন্য শোকর করো, আর যা তোমার কাছে মন্দ লাগে তার উপর ছবর করো। আর যদি সংশোধন করতে চাও তাহলে ভালো দিকগুলোর প্রশংসা করো, তারপর কোমল ভাষায় বলো, তোমার এই বিষয়টা যদি না থাকতো তাহলে তুমি আরো অনেক ভালো হতে। তবে আল্লাহর পেয়ারা হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ মনে রাখতে হবে, একটু বাঁকা থাকবেই, এই বক্রতা, সাহিত্যের ভাষায় যাকে বলে নায, আন্দায, মান, অভিমান, লাস্যতা, এই বক্রতা নারীর সৌন্দর্য, নারীর শক্তি। এটাকে সেভাবেই গ্রহণ করে তার সঙ্গে জীবন যাপন করতে হবে, পূর্ণ সোজা করতে চাইলে ভেঙ্গে যাবে, আর সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে।

সত্যি সত্যি যদি তোমার স্ত্রীর গুরুতর কোন ত্রুটি থাকে তবে সেটা সংশোধনের দায়িত্ব ও কর্তব্য অবশ্যই তোমার। তবে সেক্ষেত্রেও সংশোধনের জন্য অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে দিনের পর দিন চেষ্টা করে যেতে হবে। ধমক দিয়ে, জোর খাটিয়ে সংশোধন করা যায় না, ঘরে অশান্তি আনা যায়, ঘর ভাঙ্গা যায়, আর সন্তানদের জীবনে বিপর্যয় আনা যায়।

ইসলামপুরে আমার আববার দোকানের অপর দিকে এক ভদ্রলোকের দোকান ছিলো। অবস্থা ছিলো এই যে, দোকানে বসেই মদ খেতো। আববা তাকে দাওয়াত দিলেন, আর সে খুব দুর্ব্যবহার

করলো, কিন্তু আববা ধৈর্যের সঙ্গে দাওয়াত চালিয়ে গেলেন। দু'বছর পর তিনি মসজিদমুখী হলেন এবং এমন মুবাল্লিগ হলেন যে, বউকে তালাক দেবেন। কারণ সে দ্বীনের উপর আসছে না।

আববা তাকে এভাবে বুঝালেন, 'আমার সঙ্গে আপনার আচরণ কি মনে আছে? আমি যদি ধৈর্যহারা হয়ে আপনাকে ত্যাগ করতাম! এই পুরো কথাটা যেহেনে রেখে স্ত্রীকে তালিম করতে থাকেন। ছবর করেন, ছবর করলে আমার প্রতি আপনার যুলুম আল্লাহ মাফ করবেন। আল্লাহ যদি প্রশ্ন করেন আমার বান্দা তোমাকে আমার ঘরের দিকে ডেকেছে, তুমি তার প্রতি যুলুম করেছো কেন? তখন আপনি বলতে পারবেন, হে আল্লাহ, আমিও আপনার বান্দীর পিছনে ছবরের সঙ্গে মেহনত করেছি।'

সেই লোকের স্ত্রী কিন্তু পরবর্তী সময়ে পরদানশীন হয়েছিলো। অথচ জোশের তোড়ে লোকটা তো ঘরই ভেঙ্গে ফেলছিলো।

আসলে দোষ আমাদের। আমরা তারবিয়াত করার তরীকা শিখিনি। বোঝানোর তরয আয়ত্ত্ব করিনি।

প্রিয় ছাত্রটিকে আরো অনেক কথা বলেছিলাম, প্রায় দু'ঘণ্টা সময় তার জন্য ব্যয় করেছিলাম। সবকথা এখন মনেও নেই।

তবে একটা কথা তাকে বলা হয়নি, এখন তোমাদের মজলিসে বলি, স্ত্রীর সঙ্গে আচরণ কেমন হবে, এ সম্পর্কে একজনকে যা বলতে শুনেছিলাম, তা ছিল খুবই মর্মান্তিক। তিনি বলেছিলেন, 'মেয়েলোক যেন তোমার মাথায় চড়ে না বসে, তাই প্রথম দিন থেকেই তাকে শাসনের মধ্যে রাখবা। পূর্ণ ইতা'আত ও আনুগত্য আদায় করে নিবা, গোরবা কুশতান দর শবে আওয়াল।'

এ প্রবাদ এমনই বিশ্ববিশ্রুত যে, আমাদের নিরীহ বাংলাভাষায়ও বলে, 'বাসর রাতেই বেড়াল মারতে হবে'। কিন্তু জীবনের সর্বক্ষেত্রের মত এক্ষেত্রেও আমাদের অনুসরণীয় হলো সুন্নাতে রাসুল। তো জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শরীয়তের সীমারেখায় থেকে স্ত্রীর সঙ্গে এমন আচরণই আমাকে করতে হবে, যাতে সে মনে করে, আমি সর্বোত্তম স্বামী, আমার মতো উত্তম স্বামী হয় না, হতে পারে না।

স্ত্রীগণের সঙ্গে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ কী ছিলো তা জানতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে। স্বামীর খেদমত করার মাধ্যমে স্ত্রী অনেক আজর ও ছাওয়াবের অধিকারিণী হতে পারে, এটা আলাদা কথা। তবে আমাকে মনে রাখতে হবে যে, এটা স্ত্রীর মহত্ত্ব, স্বামীর অধিকার নয়। তারা যদি কখনো মায়ের বাড়ী যেতে চায়, আমরা প্রশ্ন করি, 'আমার খাওয়া-দাওয়ার কী হবে?' অথচ এটা তার বিবেচনার বিষয় হতে পারে, আমার প্রশ্ন করার বিষয় নয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সামান্য কথা বলেই মজলিস শেষ করছি। সহবাস দাম্পত্য জীবনের একটি অপরিহার্য সত্য। এ বিষয়ে আলোচনাকে হায়া-শরমের খেলাফ মনে করা হয়। ফলে বিষয়টি অজ্ঞতার মধ্যে থেকে যায়। একারণে এমনকি অনেক সময় দাম্পত্য জীবন বিষাক্ত হয়ে পড়ে।

স্ত্রী তোমার সারা জীবনের সম্পদ এবং সেরা সম্পদ। মানে সম্পত্তি নয়, ভোগের বস্তু নয় মানে সম্পদ, ঐশ্বর্য। বিষয়টি বুঝতে না পেরে আধুনিক বুদ্ধিজীবীরা হাদীছের সমালোচনা করেন। আমরা হাদীছটির তরজমা ও ব্যাখ্যা এমন খন্ডিতভাবে করি যে, তারাও সুযোগ পেয়ে যায়।

তো স্ত্রী তোমার সম্পত্তি নয়, স্ত্রী হলো তোমার জীবনের সর্বোত্তম সম্পদ, যা যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে তোমাকে রাখতে হবে এবং ব্যবহার করতে হবে।প্রথমেই বর্বর ও পাশবিকরূপে নিজেকে স্ত্রীর সামনে তুলে ধরা বিরাট মুর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। স্ত্রী স্বামীর ভোগের পাত্রী নয়, বরং স্বামী-স্ত্রী হলো পরস্পরকে উপভোগ করার জন্য। যত দিন লাগে, দীর্ঘ সাধনা করে প্রথমে হৃদয় জয় করো, মনের দুয়ার খোলো, অন্তরের গভীরে প্রবেশ করো।

যিন্দেগীর এই কঠিন মারহালা সম্পর্কে কত কিছু যে বলার আছে, কত কিছু যে শেখার আছে! দেখি, যদি আবার কখনো সুযোগ হয়।

মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ (মাসিক আল-কাওসার)

স্বামী কি স্ত্রীর পাশে বন্ধু হতে পারে?

আমি তখন সবেমাত্র কলেজে উঠেছি। একদিন পত্রিকার পাতায় একটি আর্টিকেল চোখে পড়লো। স্বামী কি স্ত্রী'র পাশে বন্ধু হতে পারে।? দু'চোখে উৎস্যুক নিয়ে পড়ে দেখি বিপক্ষে অবস্থানকারীদের সংখ্যাই বেশী। চুপি চুপি বলি পাঠক, আমার কলেজের বিশেষ একজন অধ্যাপিকা ম্যাডাম ও দেখি সেই দলে। আর সমর্থন করেছেন যারা তাদের সংখ্যা ২/১ জন শুধু। স্বামীরা যে বস সুলভ আচরণ করেন, স্ত্রী'র ক্যরিয়ারকে মেনে নিতে পারেন না, নিজের ডিসিশনকেই বেশী প্রাধান্য দেন ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় তারা তুলে ধরেছেন। পুরো আর্টিকেলটি পড়ে মনে হল স্বামী শব্দটির সাথে স্বার্থপর, সংকীর্ণমনা,স্বৈরাচারী এধরণের শব্দগুলোর গোপন এক আঁতাত আছে।

বন্ধুদের মাঝ হতে আমার বিয়েটা বেশ তাড়াতাড়িই হয়েছিলো। আমি যখন অনার্স ফাস্ট ইয়ারে পড়ি তখন। আমি মনে মনে ভাবলাম ইয়া আল্লাহ সত্যিই এবার বিপদে পড়েছি। আমি যদিও পরিবারের সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান কিন্তু তাই বলে যখন তখন ২৪ ঘন্টা কেউ আমার উপর হম্বি তম্বি করুক সেটা আমার একদম পছন্দ নয়। তাই শুরু হল আমার ওয়াচিং এর পালা।

বিয়ের কয়েক দিনের মাঝেই খেয়াল করলাম আমার 'স্বামী' বাইরে বের হলেই ফুল কিনে আনে। আজ এত বছরে ও সেই অভ্যাসের নড়চড় হয়নি। আমার প্রবাসী জীবনে তো বটেই। ১ মাসের জন্য বাংলাদেশে গেলেও ও ফুল কিনতে ভুল হয় না ওর। একদিন কথা প্রসঙ্গে বড় আপু বলেছিলো আমি যে ফুল খুব পছন্দ করি সেটা আপুর কাছ হতে ও শুনেছিলো। গত ২/১ বছর আগের ঘটনা। জরুরী প্রয়োজনে আমার স্বামীকে ২ সপ্তাহের জন্য একাই দেশে যেতে হল। আমার এর আগে কখনো এরকম একা থাকার অভিজ্ঞতা নেই। তাই প্রথম প্রথম খুব ভয় পেলাম। পরে ভয়টা অভিমানে রুপ নিলো। ঠিক করলাম ও জেদ্দায় ফিরলে কথা বলা বন্ধ করে দেব। এয়ারপোর্ট হতে যখন বাসায় ফিরলো আমি দরজা খুলে সালাম দিলাম। রজনীগন্ধার একঝলক সৌরভ এসে আমার নাকে লাগলো। ফুলপ্রেমী আমার নাক রজনী গন্ধাকে ভুলে যাবে এ হতেই পারে না। কিন্তু ব্যপারখানা কি? হঠাৎ দেখি ও মুচকি হেসে পেছনে লুকিয়ে রাখা হাতটা বের করে আনলো। ওমা প্রায় ৫০টার মত রজনী গন্ধা। অভিমান কি আর থাকে পাঠক। আমার মেঘ

বিদূরিত মুখ লুকাতে গলায় প্রাণপণে গাম্ভীর্য ধরে বললাম- আহা ফুল গুলো তাড়াতাড়ি দাও। বেচারারা এতটা পথ পেরিয়ে এসেছে। নিশ্চয় ওদের পানির তেষ্টা পেয়েছে।

আমার বিয়ের আগে রান্নার অভিজ্ঞতা শুধু দু'দিন চা বানানোর মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিলো। বিয়ের পর যখন প্রবাসী জীবন শুরু হল তখন তো কিছুই রাঁধতে পারিনা। কাকে দিয়ে যে কাকে রাঁধে সে জিনিসটাই আমি বুঝতাম না। আমার 'স্বামী'র কাছ হতে জানলাম ১ কাপ চালে ২ কাপ পানি দিতে হয়। আর যে কোন তরকারি রাঁধতে হলে তেল, পেঁয়াজ , লবণ, মশলা অত্যাবশ্যকীয় জিনিস। ব্যস শুরু হল রান্নায় হাতখড়ি। প্রথম প্রথম ভাত, ডাল আর ডিম ভাজতাম শুধু। এমনও অনেক বার হয়েছে আমার নিজের রান্না আমি নিজেই খেতে পারিনি। কিন্তুসেই শুরু হতে এত বছর জীবনে আমার স্বামী কখনো বলেনি তোমার ওই রান্নাটা ভালো হয়নি। সব সময় হাসি মুখে খেয়ে উঠেছে।

আমি ছোট বেলায় খুব খাবার বাছাবাছি করতাম। ২/৪ রকম মাছ ছাড়া তেমন কোন মাছই খেতাম না। একদিন ছোট ভাইয়া ইংল্যান্ড হতে ফোন করে আমার হ্যজব্যন্ডকে বলল- ও তো খাবার নিয়ে আপনাকে খুব বিরক্ত করে তাই না? ছোট বেলা দেখতাম আম্মুকে খুব জ্বালাতো। আমার স্বামী দেখি এদিক হতে জবাব দিলো – ও যেটা পছন্দ করে না আমি সেটা বাসায়ই আনিনা। আসলেও তাই প্রথম প্রথম আমি মাছ খাইনা বলে ও তেমন মাছ আনতো না। কিন্তু পরে আমি ভেবে দেখলাম- আহা বেচারা মাছ খেতে এত পছন্দ করে। তখন হতে আমি ও একটু একটু খেতে শুরু করলাম। এখন আলহামদুলিল্লাহ অনেক মাছই খেতে পারি।

জীবনের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটের সাথে মিল রেখে কখনো প্রিয় স্বদেশ ছাড়তে হবে এটা আমার কল্পনার ও অতীত ছিলো। তাই বিয়ের সময় এ নিয়ে খুব মন খারাপ ছিলো। তাছাড়া তখনো আমার পড়ালিখাটা শেষ হয়নি। তাই ভেবেছিলাম বিয়ের পর লিখাপড়ার সাথে জনমের মত ছেদ পড়ে গেল। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমার স্বামী আমার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আমাকে পড়ার পূর্ণ সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ডিগ্রী পরীক্ষা দিতে গিয়ে প্রথম ভিসাটাই ক্যনসেল হয়ে গেল। পরে ও মাষ্টার্সের সময় সেশন জটের কারণে আমাকে বছরে ২/৩ বার ও দেশে যেতে হয়েছে। ততদিনে আমার প্রথম দুটো সন্তানের ও জন্ম হয়। কিন্তু আমার স্বামী কখনো আমাকে বাধা দেয়নি। বিয়ের সময় যেসব নিন্দুকেরা বাঁকা ভাবে বলেছিলো- গেলো অত মেধাবী মেয়েটার পড়া এবার বারোটা বেজে গেল। তারাই দেখতাম পরবর্তীতে বলতো- তোমার স্বামী তো দেখি জেদ্দা আর বাংলাদেশকে বাড়ি আর উঠোন বানিয়ে ফেলেছে।

মনে পড়ে আমার মাষ্টার্স কমপ্লিট হবার পর একদিন এক ভাবী ফোন করে বললেন- ভাবী আপনি শপথ করে বলেন তো আপনার স্বামী আপনাকে চাকরী করতে লিখাপড়া করায়নি। আমি বললাম- প্রশ্নই উঠেনা। তখন মহিলা কাঁদ কাঁদ গলায় বললেন- ভাবী অনার্সে আমার এত ভালো রেজাল্টের পর ও আমার স্বামী আমাকে মাষ্টাসটা কমপ্লিট করতে দিচ্ছেনা। অথচ ওর সামর্থ আছে। আমি যখন আপনার কথা বললাম তখন বলল- দেখ গিয়ে উনাকে দিয়ে উনার হ্যজব্যন্ড চাকরি করাতে চান।

আমি একবার চাকরি নেব কিনা ওর মতামত চাইলে ও বললো- তোমার ইচ্ছে। আমি জোর খাটিয়ে কিছু বলবো না। তবে তুমি এখন তোমার অবসরটা কিছু সৃষ্টিশীল কাজে লাগাতে পারছো। তাই বলবো তোমার অবসরটা কারো কাছে বেঁচে দিও না। আমার ওর পরামর্শ গ্রহণ করেছিলাম।

আমি মাঝে মাঝে কিছু হাতের তৈরী শোপিস বানাই। আমার স্বামী সব সময় আমার এই কাজের সহযোগী। একদিন তো একটি গাছের চ্যাপ্টা গুঁড়ির উপর আর একটি মরা গাছের কান্ড লাগিয়ে একটি পাহাড়ী গ্রাম বানাচ্ছি। সব কিছু ঠিকমত হল। কিন্তু আলাদা কান্ডটা কিছুতেই লাগাতে পারছিনা। আমি অভিমান করে বললাম- ঘরে কি কেউ নেই আমাকে একটু সাহায্য করবে? সঙ্গে সঙ্গে ও এসে লেগে গেল। দু'জন মিলে এই কাজ শেষ করে ঘুমুতে গেলাম প্রায় রাতের ১টা।

আমি আমার পরিবারে ছোট ছিলাম বলে আমার যে কোন ডিসিশনে বড়দের ভূমিকাই বেশী ছিলো। বিয়ের পর দেখি যে কোন ব্যপারে আমার স্বামী আমার সাথে পরামর্শ করে। সত্যি বলছি পাঠক আমি অবাক হয়ে মনে মনে ভাবতাম সব ব্যপারে আমাকে এত জিজ্ঞেস করার কি আছে। আমাদের বাসায় তো আমাকে এভাবে গুরুত্ব দেয়া হত না। পরে পরে বুঝেছি আসলে দু'জনের যৌথ জীবন যাপনে এই দিক গুলোর ঘাটতি অনেক পরিবারে মনোমালিন্যের কারণও ঘটায়।

আমি মাছের ডিম খেতে খুব পছন্দ করি সেটা বড় মাছ হোক আর ছোট একটি পুটি মাছের ডিমই হোক। আমার বিয়ের পর হতেই দেখি যখনই খেতে বসি আমার স্বামী মাছের ডিম পেলেই সেটা প্লেটের একপাশে সরিয়ে রাখে। পরে কেউ না দেখে অমনি করে আমার প্লেটে চালান করে দেয়। আমি মনে করি অতটুকু মাছের ডিম আসলে কোন বিষয় না । কিন্তু ও যে আমার ছোট খাটো পছন্দের ও খেয়াল রাখে সেটা ভেবেই বেশী ভালো লাগে। আর এখন তো আমরা এক সাথে খেতে বসলে ও যখন মাছের ডিমটা আমার প্লেটে চালান করে দেয় তখন বাকী তিনজন হৈ হৈ করে বলে- আব্বু, তুমি আম্মুর প্লেটে কি দিলে? তখন কি আর করা আমি সেই কড়ে আঙ্গুলের

অর্ধেকের মত ডিমটিকে ৫ভাগ করে সবার প্লেটে একটু একটু ডিস্টিবিউট করি। খাদ্য হিসেবে যদিও জিনিসটি তেমন কিছুই নয়। কিন্তু আমাদের ৫ সদ্যসের মাঝে ভালোবাসার উষ্ণতা ছড়াতে সত্যিই কিন্তু অনেক কিছু।

আসলে আমি মনে করি স্বামী স্ত্রী'র মাঝে বন্ধুত্বের একটি বন্ধন তৈরী করতে অনেক বেশী পরিশ্রমের দরকার হয়না। একজন অন্যজনের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, অন্যের পছন্দের গুরুত্ব দেয়া,পারস্পরিক পরামর্শ, একে অন্যকে বুঝতে পারাএ ধরণের বিষয়গুলোকে খেয়াল করলেই চলে। আজকাল অনেক উচ্চশিক্ষিত স্বামী-স্ত্রী'র মাঝে যে অহরহ পরিবার ভাঙ্গার ঘটনা ঘটে আমি মনে করি এর মূলে বড় কোন ব্যপার দায়ী নয়। শুরুর কথায় আসি আমি কিন্তু আমার পারিবারিক জীবনে পথ চলায় স্বামী শব্দটির অর্থ পাই- সহমর্মী, সহানুভূতিশীল সবচেয়ে কাছের বন্ধু হিসেবে।

আমার স্বামীর এক কলিগ একবার ওকে জিজ্ঞেস করেছিলো- আপনাদের মধ্যে তো কখনো ঝগড়া হয় না তাই না? আমি বলবো খুনসুটি ছাড়া সম্পর্ক গুলো বড় বেশী ফরমাল মনে হয়। তবে আমরা সেই খুনসুটিকে কখনো বাড়তে দিইনা। আর আমার পিচ্চি মেয়েটি তো আছে আমাদের দু'জনের হাতটা মিলিয়ে দিয়ে বলবে – এখন তোমরা ফ্রেন্ড হও।

তাই বলবো স্বামী -স্ত্রী আসলে একে অন্যের বন্ধু হতে পারেন কিনা এটা সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। আসুন আমরা এখন হতেই এই সম্পর্কের প্রতি যত্নবান হই।

নূর আয়েশা সিদ্দিকা

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ক্লান্তি ও বিরক্তি যখন আসে

বিয়ের পর থেকেই আপনার অস্তিত্বের সাথে আরেকটা মানুষ জুড়ে রয় প্রায় প্রতিটি মূহুর্তেই। উপস্থিতিতেই থাকুন বা অলক্ষ্যেই থাকুন অপরজন আপনার সত্ত্বার সাথে মিশেই থাকেন। স্বামী-স্ত্রী হওয়া এই দু'জন মানব-মানবী পরস্পরের পরিপূরক। একজন মানুষ ব্যক্তিগতভাবে যতই অসাধারণ হন না কেন, সৃষ্টিগতভাবে তার যেই সীমাবদ্ধতাগুলো, সেগুলোকে ঢেকে রাখেন সেই প্রিয়জনটি, তিনি আপনার শারীরিক-মানসিক-আত্মিক অভাবগুলোকে মেটাতে সাহায্যকারী হবার যোগ্যতা রাখেন। কিন্তু তবুও, মাঝে মাঝে সম্পর্কটির অনেক কিছুর কথা ভেবেই নিজেকে যেন অনেক ক্লান্ত মনে হয়। মনে হতে পারে-- এত সব কষ্ট, এত আবেগ আর পরিশ্রম আমার কি বিফলে যাচ্ছে? এরকম ক্লান্ত-শ্রান্ত হওয়া অনুভূতিগুলোকে ভুল বুঝবেন না, এটা মানবিক। তবে এরকম ক্লান্তির সাথে ভর করে শয়তান কাজ করবে আপনার উপরে। দাম্পত্য জীবনটাকে নিপুণ জীবন ধরে নিবেন না দয়া করে। এই জীবনটা গড়ে নেয়ার, দু'জনে মিলে গড়ে তোলার।

জীবনসঙ্গীর জন্য আপনি ক্রমাগত অনেক পরিশ্রম করেন...আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য স্বামী/স্ত্রীর জন্য যে কষ্টটুকু,খরচটুকু আপনি করেন তার উত্তম প্রতিদান আল্লাহ নিশ্চয়ই দিবেন। কিন্তু তাই বলে মানসিক বা শারীরিক টায়ার্ডনেসের ফলে অপরজনের উপরে বিরক্তি বা নিজেদের সংসার বা সম্পর্কের উপরে বিরক্ত যদি হয়ে পড়েন--তাহলে মনে রাখবেন আপনি শয়তানের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছেন। মনে রাখবেন, এই মন এবং শরীরের স্রষ্টা যিনি--তার কাছেই শক্তি চাইতে হবে। আপনার স্বামী/স্ত্রীও দুর্বল;তিনিও একজন ভুলত্রুটি মেশানো একজন মানুষ। সম্পর্ককে তাজা রাখতে তাই আপনার নিজেরও তাজা থাকা প্রয়োজন। অনেকসময় আপনার নিঃশব্দ আলিঙ্গনটুকু আপনার জীবনসঙ্গী বা জীবনসঙ্গিনীকে অনেকখানি আশ্বস্ত করে, শক্তিশালী করে। সম্ভব হলে এই কাজটুকু কেন করবেন না?

যখন পরিশ্রান্ত লাগবে, আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আপনার অন্তরকে, শরীরকে, মনকে উদ্দীপ্ত করে দেন। দোয়া করুন যেন আল্লাহ আপনাদের দু'জনকে দু'জনার চক্ষুশীতলকারী সঙ্গী হিসেবে কবুল করেন। শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে সাবধান থাকবেন। স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র সম্পর্কে ফাটল ধরিয়ে শয়তান একেকজনকে হতাশ করে দেয়, যা আরো অনেক পাপকাজের সূচনা করে। আল্লাহ আমাদের পরিবারগুলোতে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিন। আল্লাহ আমাদের স্বামী-স্ত্রীর

সম্পর্কগুলোকে শয়তানের কুমন্ত্রণা ও খারাপ মানুষের হিংসা থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ তো প্রেমময় ও ক্ষমাশীল।

যখন আপনার স্বামী/স্ত্রীর সাথে আপনার মতপার্থক্য হবে, বুঝবেন এটাই স্বাভাবিক। দু'জন মানুষের মাঝে খুব বেশি মিল থাকা সম্ভব হয় না কখনো। একই প্রাণ, একই আত্মা -- এইসব কেবলই গল্প-উপন্যাস -মুভির বিষয়। বাস্তব জীবনে আপনাদের অতীত আলাদা, আপনাদের চিন্তার ধরণ আলাদা, আপনাদের শৈশব-কৈশোর আলাদা। এই ভিন্নতার পরেও দু'জনে দু'জনার খুব কাছের মানুষ কেননা আপনারা দু'জনে একসাথে হয়েছিলেন দুইজনের সত্ত্বা হারিয়ে এক হয়ে মিশে যেতে নয়, বরং দু'জন পাশাপাশি একটি অভিন্ন লক্ষ্যে যাত্রা করতে। আর জান্নাতে যাওয়ার সেই প্রচেষ্টা মৃত্যু পর্যন্ত আপনি ছেড়ে দিবেন না নিজের স্বার্থেই, তাইনা? স্বামী-স্ত্রী দু'জনের কিছু ভিন্নতা কিন্তু প্রত্যেকের জীবনে ভারসাম্য তৈরি করে দেয়। মনোমালিন্য হলে সেই দুরত্বটুকুকে জোড়া লাগাতে উদ্যোগ নিয়ে ফেলুন।

নিজে থেকে সমস্যা সমাধান করতে প্রথমে এগিয়ে আসলে যদি তখন মনের মাঝে জেগে ওঠা পরাজিত হবার টনটনে অনুভূতি, অহং বা দেমাগকে এই সুন্দরতম সম্পর্কতে হিসেবে নিয়ে আসেন তবে আপনি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এই সম্পর্কটার গোটাটাই আপনার --জীবনসঙ্গীর ভালো থাকা আসলে আপনারই ভালো থাকা। তাই দু'জনের ভিন্নতাটুকুকে গ্রহণ করে নিন এবং অপরজনকে স্বস্তি দিতে একটু যদি স্যাক্রিফাইস করতেই হয়, তবে করে ফেলুন। দেখবেন এটুকুর কারণে আপনি যেই আনন্দ আর শান্তি উপভোগ করবেন তা আপনার ওটুকু কষ্টকে ভুলিয়ে আপনাকে অদ্ভুত সুন্দর অনুভূতি দিবে। সুন্দর দাম্পত্য জীবনটা রেডিমেড পাওয়া যায় না, তাকে তিলে তিলে গড়ে নিতে হয়। গড়ে ওঠা সেই শান্তির বাড়ির কারিগর কিন্তু মূলত আপনিই! জ্বি, আপনি এবং আপনারা দু'জন...

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে চিড় ধরাতে পারলে শয়তান প্রচন্ড আনন্দিত হয়, সে এমন প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকে যেন ছোট্ট ভুলকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রী রাগারাগি করে পারস্পরিক অশান্তি তৈরি করে এবং ফলশ্রুতিতে যেন বড় বড় অন্যায় এবং পাপের জন্ম হবার সুযোগ তৈরি হয়। আল্লাহর কাছে সবসময় দোয়া করুন যেন আল্লাহ আপনাদের সম্পর্ককে যাবতীয় অকল্যাণের হাত থেকে রক্ষা করেন। রাগ হলে কথা না বলে সংযত হোন। আপনার পছন্দ/অপছন্দ এবং ইগোর চেয়ে আপনাদের সম্পর্কটিকে মূল্য দিন। চিৎকার করবেন না, বাজে শব্দ ব্যবহার করবেন না। মনে রাখবেন, রাগান্বিত হয়ে আপনি যা করবেন সবই অকল্যাণকর হবে। আল্লাহ আমাদের রাগ সংযত

করার তাওফিক দান করুন। আল্লাহ আমাদের পরিবারগুলোকে অন্যায় ও অকল্যাণের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখুন।

আপনার জীবনসঙ্গীকে আপনি ভালোবাসেন, এই কথাটা শেষ কবে বলেছেন? ছোট্ট অভিমান, কিছু বিরক্তি কিংবা অপূর্ণতাকে পুঁজি করে তাকে আপনার ভালোবাসার কথা বলা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন না। কে জানে, এমনো তো হতে পারে হয়ত আপনি তাকে "আমি তোমাকে ভালোবাসি" কথাটা বলার আরেকটা সুযোগ পাবেন না। ভালোবাসার মানুষটিকে ভালোবাসার কথা বলুন, শুধু তার কাছ থেকে কিছু পেতে চেয়ে নয়, বরং বলুন আপনার নিজের জন্যই। আপনি যখন ভালোবাসবেন, তখন নিজেকে অভিমান, রাগ, ক্ষোভের কারাগার থেকে নিজেকে মুক্তি দিতে পারবেন। আপনার ভালোবাসার কথা ও আবেগ আপনার কাছে ভালোবাসা ফিরিয়ে দেবে। আপনার জীবনসঙ্গী/জীবনসঙ্গিনীকে দিনে অন্তত একবার বলুন যে তাকে আপনি ভালোবাসেন। ভালোবাসা এবং ভালোবাসার কথা আমাদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলে, প্রিয়জনদের প্রতি ভালোবাসা আমাদেরকে মুক্তির প্রশান্তিময় অনুভূতি দেয়।

সম্পর্ক টিকে থাকে জটিল সময়ে ধৈর্য ও ভালোবাসায়

একবার এক দম্পতিকে জিজ্ঞাসা করা হলো তারা কীভাবে একসাথে ৬০ বছর কাটিয়েছিলেন। তারা উত্তর দিয়েছিলেন, আমরা যে সময়টাতে জন্মেছিলাম তখন কোন কিছুতে সমস্যা দেখা দিলে তার মেরামত করে সারিয়ে নিতাম, ছুঁড়ে ফেলে দিতাম না।

আপনাদের সম্পর্কটি খেয়াল করুন। দেখবেন প্রতিদিনই হয়ত নিত্যনতুন কিছু সমস্যা আসবে। কিন্তু আল্লাহকে স্মরণ রেখে, তার কাছে সাহায্য চেয়ে বিষয়গুলো দু'জনে মিলে আলাপ করুন। ভালোবাসার এই সম্পর্কটিতে অপরজনের কাছে ছোট হবার মতন কিছু নেই কেননা সংসার আপনাদের দু'জনের মিলেই। আপনিই বরং আগে ক্ষমা চেয়ে নিন, তার প্রতি আপনার ব্যাকুলতার কথাটি বোঝান। আপনি ভালো থাকা মানে তিনি ভালো থাকা, তার ভালো থাকাও আপনার ভালো থাকা।

সমস্যা হলে সমাধান করার কথা ভাবুন। দেখবেন ভালোবাসা আর আন্তরিকতা দিয়ে যেকোন পরিস্থিতিই সামাল দিতে পারবেন দু'জনের মাঝে। শয়তান খুবই খুশি হয় দাম্পত্য সম্পর্কে অশান্তি তৈরি করতে পারলে। খেপে যাবেন না। আল্লাহর কাছে সাহায্য চান, মাথা ঠান্ডা রাখুন।

ভালোবাসা দিয়ে, ধৈর্য দিয়ে পরিস্থিতি মোকাবেলা করুন। দেখবেন ছোট ছোট সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠে আপনার স্বামী/স্ত্রীকে আপনি আরো বেশি ভালোবাসবেন। আল্লাহ আমাদের পরিবারগুলোতে শান্তি দান করুন।

আপনার স্বামী বা স্ত্রী হয়ত আপনার সাথে এমন কথা বলেছেন কিংবা আচরণ করেছেন যা আপনার বেশ গায়ে লেগেছে, তবু যখন আপনি রাগ দেখিয়ে, জেদ প্রকাশ করে তাকে পালটা আহত করছেন না -- এর অনেকগুলো কারণের একটি হলো, আপনাদের সম্পর্কটাকে আপনি আপনার অহং বা ইগোর চাইতে উপরে স্থান দিচ্ছেন।

অভিজ্ঞরা বলেন, বেশিরভাগ দাম্পত্য সম্পর্কের ফাটল দেখা দেয় মূলত সূক্ষ্ম কিছু অমিল আর ঘটনাকে কেন্দ্রে করে যা বিবর্ধিত হতে হতে ভয়াবহ আকার ধারণ করে যার একটি প্রধান কারণ অহংবোধ বা ইগো।

সমাধানের আগ্রহ নয়, দু'জনার সম্পর্কটাকে বড় করে দেখা নয় বরং যখন নিজেকেই বেশি বড় করে দেখা হয়, তখন সম্পর্কে বিষ ঢুকে পড়ে। অহংবোধ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সমস্যাগুলোর সমাধানের আগ্রহটুকুও নষ্ট করে ফেলে। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আমাদেরকে অহংবোধ থেকে মুক্তি দিন, জীবনসঙ্গীর প্রতি আন্তরিকভাবে কর্তব্য করে যাওয়া, দু'জনে মিলে সংসারটিকে সুন্দর করে গড়ে তোলার ও নিজেদের মাঝে সহমর্মিতা গড়ে তোলার তাওফিক দিন।

দ্বীনের অর্ধেক

আপনার জীবনসঙ্গী কিন্তু একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ নন, সেটা আশা করাও উচিৎ নয়। কল্পনার নায়ক বা নায়িকা যাকে অনেক মানুষ গড়ে তোলে ছোটবেলা থেকে, তার সাথে বাস্তব কখনো মিল হয় না। আপনার স্বামী বা স্ত্রী একজন মানুষ, যিনি তার দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন আপনার সাথে বন্ধন গড়ে। আপনি তার পোশাকের মতন, তিনিও আপনার জন্য তেমন। দু'জনের বন্ধন একে অপরের পরিপূরক হবার মাঝে। কিন্তু কখনো ভাববেন না তিনি হবেন 'পরম ও পরিপূর্ণ'।

মানুষটার কথা শুনুন মন দিয়ে। আপনার সাথে দেখা হবার আগে তার একটা জীবন ছিলো -- আপনার মতই যুদ্ধ করে বেড়ে ওঠা, অনেক অনুভূতির, অনেক স্পর্শকাতরতার, অনেক তিক্ত আর মধুর স্মৃতিভরা। তার জীবনটাকে শ্রদ্ধা করুন। শ্রদ্ধা ও সম্মান পাওয়ার শর্তও পৃথিবীতে তেমনি -- আগে নিজেকে করতে হয়। আপনার জীবনসঙ্গী/জীবনসঙ্গিনী আপনার কারণে, আপনার অস্তিত্বের

অনুপ্রেরণায় জগতের আর সব অশ্লীলতা থেকে সরে আছেন, থাকবেন -- তার প্রতি কোমল হওয়াও প্রয়োজন।

আমাদের ভালোবাসাগুলো কিন্তু টেলিভিশনের পর্দায় দেখা বিশাল বিশাল বিষয়ের মাঝে নয়, বরং জীবনের নিত্যদিনের ছোট্ট ছোট্ট হাসির মাঝে, ভালোবাসার দু'টি বাক্যের মাঝে, অন্যের জন্য মন-শরীর-হৃদয় দিয়ে করা কাজগুলোর মাঝে জড়িয়ে থাকে। ভালোবাসুন, ভালোবাসাও কিন্তু এই জীবনযুদ্ধের প্রাত্যহিক কষ্টগুলোরই একটা অংশ।

মহীয়সী

[এ গল্পটি বলেছিলেন কার্ডিওভাসকুলার সার্জন প্রফেসর খালিদ আল জুবাইর, তারই এক লেকচারে।]

একবার আমি আড়াই বছরের এক বাচ্চার চিকিৎসা করি। এটা ছিল এক মঙ্গলবার এবং বুধবারে বাচ্চাটির স্বাস্থ্য বেশ ভালই ছিল। বৃহস্পতিবার সকাল ১১.১৫ এর দিকে ... আমি কখনই ঐ সময়টার কথা ভুলতে পারবো না তখনকার প্রচন্ড আলোড়নের কারনে। এক নার্স আমাকে এসে জানালো যে একটি বাচ্চার হৃদযন্ত্র এবং শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। আমি তাড়াতাড়ি বাচ্চাটির কাছে গেলাম এবং প্রায় ৪৫ মিনিটের মত *কার্ডিয়াক মাসাজ* করলাম। এই পুরো সময়টা জুড়ে হৃদপিন্ড কাজ করে নি।

তারপর, আল্লাহর ইচ্ছায় পুনরায় হৃদপিন্ড তার স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করলো এবং আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। আমি শিশুটির পরিবারকে তার অবস্থা সম্পর্কে জানাতে গেলাম। আপনারা হয়ত জানেন যে, রোগীর পরিবারকে তার খারাপ অবস্থা সম্পর্কে জানানোর বিষয়টা কতটা বিব্রতকর। একজন চিকিৎসকের জন্য এটা সবচাইতে কষ্টসাধ্য কাজগুলোর একটি যদিও এর দরকার আছে। তাই আমি বাচ্চার বাবাকে খুজতে লাগলাম কিন্তু পাচ্ছিলাম না। তখন আমি বাচ্চাটির মাকে দেখতে পেলাম। আমি তাকে জানালাম যে রোগীর গলায় প্রচুর রক্তক্ষরন হৃদপিন্ডের এই হঠাৎ অচলাবস্থার কারন; আমরা রক্তক্ষরনের সঠিক কারন বলতে পারছি না এবং আশংকা করছি তার মস্তিষ্ক মরে গেছে। ... আপনাদের কি মনে হয়? এ কথা শুনে বাচ্চাটির মায়ের প্রতিক্রিয়া কি ছিল? সে কি কান্না শুরু করেছিল? আমাকে দোষারোপ করছিলো? না। এমন কিছুই হয় নি। বরং তিনি বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ! (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহতা'আলার)" এবং চলে গেলেন।

প্রায় ১০ দিন পর, বাচ্চাটি নড়তে শুরু করলো। আমরা আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম এবং খুব আনন্দিত হলাম এ কারনে যে তার মস্তিষ্কের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। ১২ দিন পর বাচ্চাটির হৃদযন্ত্র আবার বন্ধ হয়ে গেল সেই একই জায়গায় রক্তক্ষরনের ফলে। আমরা ৪৫ মিনিটের মত আরেকটা *কার্ডিয়াক মাসাজ* করলাম কিন্তু এবারে আর কাজ হল না, হৃদপিন্ড চালু হলো না। আমি বাচ্চার মাকে জানালাম যে, আর কোন আশা নেই। তখন সে বলল,

“আলহামদুলিল্লাহ! হে আল্লাহ, যদি ওর সুস্থতায় কোন মঙ্গল থেকে থাকে তবে ওকে সুস্থ করে দাও, হে আমার প্রভু!”

আল্লাহর অশেষ রহমতে একটু পরে বাচ্চার হৃদপিন্ড আবার সচল হলো। একজন অভিজ্ঞ *ট্রাকিয়া* বিশেষজ্ঞ রক্তক্ষরন বন্ধ করতে সক্ষম হওয়ার পর হৃদপিন্ডের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা পর্যন্ত এই ছেলেটি আরো ৬ বার এরকম হৃদপিন্ডের অচলাবস্থার স্বীকার হয়েছিল। ইতোমধ্যে সাড়ে তিন মাসের মত হয়ে গেছে এবং বাচ্চাটি সুস্থ হচ্ছিল বটে কিন্তু চলাফেরা করতে পারছিল না। তারপর যখনই সে একটু করে চলতে আরম্ভ করলো, এর চাইতেও অদ্ভুত এবং বিরাট আরেক মস্তিষ্কের সমস্যা দেখা দিল তার, যা আমি কখনও এর আগে দেখি নি। আমি তার মাকে এই মারাত্নক ঝামেলার কথা জানালাম এবং তিনি কেবল বললেন, “আলহামদুলিল্লাহ!” এবং চলে গেলেন।

আমরা অনতিবিলম্বে বাচ্চাটিকে অন্য একটি *সার্জিকাল ইউনিটের* হাতে তুলে দিলাম যারা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র নিয়ে কাজ করে এবং তারা বাচ্চাটির চিকিৎসা চালিয়ে যেতে লাগলো। তিন সপ্তাহ পর বাচ্চাটি মস্তিষ্কের জটিলতা কাটিয়ে উঠলেও নড়াচড়া করতে পারছিল না। আরো দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেল এবং এখন অদ্ভুত এক রক্তদুষনের স্বীকার হলো এবং শরীরের তাপমাত্রা প্রায় ৪১.২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে (১০৬ ডিগ্রী ফারেনহাইট) উঠলো। আমি পুনরায় বাচ্চার মাকে এই ভীষন নাজুক পরিস্থিতির বিষয়ে অবহিত করলাম এবং তিনি বরাবরে মতনই ধৈর্য্য ও দৃঢতার সাথে বললেন, “আলহামদুলিল্লাহ! হে আল্লাহ, যদি ওর সুস্থতায় কোন মঙ্গল থেকে থাকে, তবে ওকে সুস্থ করে দাও।”

৫ নং বেডের বাচ্চার পাশে বসে থাকা এই মায়ের সাথে কথা শেষে আমি গেলাম ৬ নং বেডের আরেক শিশুর কাছে। এই শিশুটির মা কাঁদছিল এবং চিৎকার করছিল, “ডাক্তার! ডাক্তার! কিছু একটা করেন। আমার ছেলের শরীরের তাপমাত্রা ৩৭.৬ ডিগ্রী সেঃ (৯৯.৬৮ ডিগ্রী ফাঃ) সে মারা যাচ্ছে! সে মারা যাচ্ছে!” আমি অবাক হয়ে বললাম, “ঐ ৫ নম্বর বেডের মায়ের দিকে তাকান। তার সন্তানের ৪১ ডিগ্রী সেঃ (১০৬ ডিগ্রী ফাঃ) এর ওপরে জ্বর। এরপরেও উনি শান্ত রয়েছেন এবং আল্লাহর প্রশংসা করছেন।” সে বললো, “ঐ মহিলার কোন বোধশক্তি নেই এবং কি হচ্ছে সে বিষয়ে কোন জ্ঞান নেই।” ঠিক এই মুহুর্তে আমার মনে পড়ে গেল রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর একটা হাদিসের কথা ... “আগন্তুকদের জন্য সুসংবাদ!” কেবল দুইটি শব্দ ... কিন্তু এই শব্দ দুটো নিঃসন্দেহে একটা পুরো জাতিকে আলোড়িত করবার ক্ষমতা রাখে। আমার দীর্ঘ ২৩ বছরের চিকিৎসা জগতের জীবনে এই বোনটির মত ধৈর্য্যশীল আর কাউকে দেখি নি।

আমরা বাচ্চাটির যত্ন চালিয়ে যেতে লাগলাম এবং ইতোমধ্যে প্রায় সাড়ে ছয় মাস কেটে গেছে এবং বাচ্চাটি অবশেষে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে বেরিয়েছে *রিকভারি ইউনিট* থেকে। হাটতে পারে না, দেখতে পায় না, শুনতে পাচ্ছে না, নড়তে পারছে না, হাসছে না ... এবং এমন নগ্ন বুক নিয়ে বেরিয়ে এসেছে যেন হৃদপিন্ডের স্পন্দনগুলো পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। শিশুটির মা নিয়মিত পোশাক পরিবর্তন করানো ইত্যাদি চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং ধৈর্য্যশীল থাকলেন আর ছিলেন আশাবাদী। আপনারা কি জানেন পরবর্তীতে এর কি হয়েছিল? আপনাদেরকে সে বিষয়ে বলবার আগে বলুন, এই শিশুটির সম্পর্কে আপনারা কি ধারনা করেন যে কিনা এত এত কঠিন রোগ-শোক, বিপদের মুখোমুখি হয়ে এসেছে? এবং এই মৃত্যুপথযাত্রী শিশুর সহনশীল মায়ের কাছে আপনারা কি আশা করেন যার কেবল মাত্রা আল্লাহতা'আলার কাছে দু'আ আর সাহায্যের প্রত্যাশা করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না? আপনারা জানেন আড়াই বছর পর কি হয়েছিল? এই শিশুটি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে ছিল আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমত এবং এই পরহেযগার মায়ের পুরষ্কার হিসেবে। সে এখন তার মায়ের সাথে দৌড়ে বেড়ায় যেন কোন দিনই তার কিছুই হয় নি এবং সে সুঠাম স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠেছে যেমনটি আগেও ছিল।

গল্প এখানেই শেষ নয়। এটা সে জিনিস নয় যা আমাকে আলোড়িত করেছিল এবং আমার চোখে পানি নিয়ে এসেছিল। যে জিনিসটি আমায় কাদিয়েছিল তা হচ্ছে,

বাচ্চাটি হাসপাতাল থেকে বের হবার প্রায় বছর দেড়েক পর অপারেশন ইউনিটের একজন আমাকে জানালো যে একলোক, তার স্ত্রী ও দুই সন্তানসহ আমার সাথে দেখা করতে চায়। আমি তাদের পরিচয় জানতে চাইলে সে বলল সে চেনে না। তো আমি তাদের দেখার জন্য গেলাম এবং দেখলাম এরা সেই ছেলেটির মা-বাবা আমি যার চিকিৎসা করেছিলাম। ছেলেটির তখন পাঁচ বছর এবং একটি ফুটফুটে ফুলের মতন স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠেছে এরই মাঝে যেন তার কখনই কিছু হয় নি। তাদের কোলে চার মাস বয়সী আরেকটি ছোট বাচ্চা ছিল সেদিন। আমি তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালাম এবং কৌতুক করে বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম এই কোলের বাচ্চাটি কি তাদের ১৩ তম নাকি ১৪ তম সন্তান। তিনি আমার দিকে চমৎকার এক হাসির সাথে তাকালেন যেন আমার জন্য তার করুণা হচ্ছে। তিনি বললেন, "সদ্য ভূমিষ্ট এই শিশুটি আমাদের দ্বিতীয় সন্তান, আর আপনি যার চিকিৎসা করেছিলেন সে ছিল আমাদের প্রথম সন্তান যাকে আমরা পেয়েছিলাম ১৭ বছরের অনুর্বরতার পর। এই শিশুটিকে পাবার পর, সে এমন সব বিপদের সম্মুখীন হয়েছে যা আপনি নিজেই দেখেছেন।"

একথা শুনে, আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারছিলাম না এবং এরই মাঝে আমার চোখ দুটো কান্নায় ভিজে উঠেছে। আমি তারপর হালকাভাবে লোকটির হাত ধরে টেনে আমার রুমে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম তার স্ত্রীর সম্পর্কে। "কে আপনার এই স্ত্রী যিনি ১৭ বছরের বন্ধাত্বের পর পাওয়া পুত্রের এত মারাত্নক সব বিপর্যয়ের মূহুর্তগুলোতেও প্রচন্ড ধৈর্য্যের সাথে মোকাবিলা করেছেন? তার অন্তর বন্ধা হতে পারে না। অবশ্যই সেটা বিশাল ইমানের দ্বারা উর্বর।" আপনারা জানেন তিনি কি উত্তর করেছিলেন? ভালো করে শুনে রাখুন হে আমার প্রানপ্রিয় ভাই ও বোনেরা। তিনি বলেছিলেন, "আমার সাথে এই মহিলার বিয়ে হয়েছিল ১৯ বছর ধরে এবং এই দীর্ঘ সময়ে আমি কখনও তাকে কোন সংগত কারন ছাড়া তাহাজ্জুদ সালাত ছেড়ে দিতে দেখি নি। আমি দেখিনি তাকে কখনও পরনিন্দা করতে, অযথা গল্প-গুজবে মত্ত হতে কিংবা মিথ্যা বলতে। যখনই আমি বাড়ি থেকে বের হয় বা ফিরে আসি সে নিজে দরজা খুলে দেয়, আমার জন্য দু'আ কর এবং আমাকে আপ্যায়ন করে। এবং সে যা কিছু করে সে সর্বোচ্চ ভালবাসা, যত্ন, সৌজন্য এবং মমত্বের পরিচয় রাখে।" লোকটি শেষ করলো এভাবে, "নিশ্চয়ই, ডাক্তার সাহেব, সে যে সমস্ত আদর্শ আচরন ও মমত্ববোধের সাথে আমার সাথে আচরন করে, আমি এমনকি তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতেও লজ্জাবোধ করি।" তাই আমি তাকে বললাম, "সত্যিই। ঠিক এমনটিই সে আপনার কাছ থেকে প্রাপ্য।"

এখানেই শেষ।

আল্লাহ বলেন,

"এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।।" (সুরা আল বাকারাহ ১৫৫-১৫৬)

বিয়েঃ ভালোবাসার মিলবন্ধন

বিয়ে আপনার জীবনের সমস্যাগুলোকে অলৌকিকভাবে সমাধান করে দিবে না

"বিয়ে আপনার জীবনের সমস্যাগুলোকে অলৌকিকভাবে সমাধান করে দিবে না। বিয়ে কিন্তু সবসময় আপনার একাকীত্ব থেকে মুক্তির কিংবা বর্তমান অবস্থাটা থেকে বের হবার কোন পথ নয়। ভাই ও বোনদের উচিত বিয়ে জীবনটাকে যাদুমন্ত্র দিয়ে বদলে দিবে এমন আশা না করে ব্যক্তিগত ও আত্মিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করা।

বিয়ে ব্যক্তিগত উন্নয়নের একটি বিশাল মাধ্যম হতে পারে, হতে পারে আমাদেরকে উত্তম মানুষ হয়ে বদলে যাওয়ার জন্য সাহায্যকারী, ইন শা আল্লাহ। একজন মানুষের প্রতি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নি'আমাতগুলোর একটি হলো সুখী-সুন্দর বিয়ে; এবং এর ফলে একটি পরিবারের সৃষ্টি, সেই পরিবারের সেবা-যত্ন করা -- যা সেরা ইবাদাতগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য এখনই তেমন কোন কাজ করতে পারছে না, কীভাবে আশা করা যায় যে আরেকজন মানুষের আরো কিছু দায়দায়িত্ব ও মালপত্র কাঁধে নিয়ে সেই কাজটি তার জন্য সহজ হবে, এমনকি যখন সেই মানুষটিও নিখুঁত নন?

আপনি নিজেই কি আপনাকে বিয়ে করতে রাজি হতেন? যদি না হন, তাহলে সেই আকাঙ্খিত অবস্থায় যেতে আপনার আরো কী কী করতে হবে? যদি হয়ে থাকেন, তাহলে কি ভেবেছেন আপনার ভালো গুণাবলীকে আরো বৃদ্ধি করতে আপনি কী করতে পারেন।"

যে মানুষটাকে ভালোবাসি তাকে আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে

"যে মানুষটাকে ভালোবাসি, তাকে আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে। আমাদের ভালোবাসা যদি হয় কেবল কাউকে দখল করে রাখার কোন চাওয়া, তাহলে তা ভালোবাসা নয়। আমরা যদি শুধু আমাদেরকে নিয়ে চিন্তা করি, শুধু আমাদের প্রয়োজনগুলোই বুঝি এবং অন্যদের প্রয়োজনকে এড়িয়ে যাই, তাহলে আমরা কখনই ভালোবাসতে পারবো না। যাদের ভালোবাসি তাদের প্রয়োজন, চাওয়া, ভালোলাগা এবং কষ্টগুলো আমাদেরকে অবশ্যই গভীরভাবে খেয়াল করতে। এটাই প্রকৃত

ভালোবাসার পথ। আপনি যখন কাউকে সত্যিকার অর্থে বুঝতে পারবেন, তখন তাকে ক্রমাগত ভালোবেসে যাওয়া থেকে আপনি নিজেকে ঠেকাতে পারবেন না।"

(Peace Is Every Step: The Path of Mindfulness in Everyday Life থেকে অনূদিত)

স্বপ্নচারী আব্দুল্লাহ

নারীর দ্বীনদারি: চাই আত্মসচেতনতা

আত্মসচেতনতা মুমিনের একটি গুণ। আত্মসচেতন না হলে প্রকৃত মুমিন হওয়া যায় না। কিছু নারীকে দেখা যায়, তারা আল্লাহর পথে চলতে আগ্রহী, দ্বীন মেনে চলতে চায়, মনটা আল্লাহর দিকে ধাবিত, কিন্তু শুধু অসচেতনতার কারণে অনেক ফরয তরক করছে কিংবা গুনাহে জড়িয়ে পড়ছে।

আমার এক বান্ধবী, যাকে আমি আমার বান্ধবীদের মধ্যে সবচেয়ে পরহেযগার মনে করি। প্রতিকূল পরিবেশেও গায়রে মাহরাম আত্মীয়ের সামনে বেপর্দা হয় না। কখনোই ইচ্ছা করে কোনো বেগানা পুরুষের দিকে তাকায় না। সাদাসিধে জীবন-যাপন করে। এক ওয়াক্ত নামাযও কাযা করে না।

ক'দিন আগে তার বিবাহ হল। হায় আফসোস! বিবাহের সময় আমি তাকে নামায কাযা করতে দেখলাম। বড় কষ্ট পেলাম। যে নাকি এক ওয়াক্ত নামায কাযা করে না, বিবাহের অনুষ্ঠানের ছুতোয় নামায কাযা করে দিল! অথচ একটু সচেতন হলেই নামায কাযা হওয়া থেকে সে বাঁচতে পারতো। তবে এক্ষেত্রে অভিভাবকদের সহায়তাও একটি বড় বিষয়। কখনো কখনো অন্যদের অসহায়তার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্বেও এমন হয়ে যায়। কিন্তু আসল বিষয় হল নিজের অদম্য আগ্রহ। আমি চাইলে যে কোনো প্রতিকূল পরিবেশকে অনুকূল করতে পারি। বিশেষ করে নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ ফরয আমলের জন্য তো আমাকে তা করতেই হবে।

তেমনি আমরা কোনো কোনো নারীকে দেখি, তিনি পর্দা করেন। কিন্তু বিবাহের সময় পর্দার খেলাফ অনেক কিছুতে জড়িয়ে পড়েন। কণে সেজেগুজে বসে আছে, আর যেই আসছে মোবাইলে তার ছবি তুলে নিয়ে যাচ্ছে। যদিও ছবি তুলছে মহিলা, কিন্তু এ ছবি তো একটু পরেই কোনো পুরুষ দেখবে। ডিজিটাল ক্যামেরার ছবি জায়েয-নাজায়েয- সে ভিন্ন কথা; ছবির ব্যাপারেই বা কেন আমাদের এত অবহেলা! পর্দানশীন নারীর জন্য এটা বড়ই ক্ষতির কারণ। এক্ষেত্রে আত্মসচেতনতার বিকল্প নেই। আগে আমাকে দ্বীন মানার ক্ষেত্রে মজবুত হতে হবে। নিজে পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারলে মুরব্বীদের জানাতে হবে, তাদের সহায়তা নিতে হবে। এ সবকিছুর জন্য চাই নিজের প্রবল ইচ্ছা।

আমার এক স্নেহভাজন ভাতিজি। মহিলা মাদরাসায় পড়ে। ছাত্রী অত্যন্ত ভাল। পরিবারে পূর্ণ পর্দা রক্ষা করা হয়। মেয়েটি একদিন আমাকে ফোনে বলল, আমরা অমুক সময় গ্রামের বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা করছি। আমি বললাম, রাস্তায় নামাযের কী হবে? সে বলল, নামায তো পড়া হবে না;

বাড়িতে পৌঁছে ক্বাযা পড়তে হবে। বললাম, সেটা কেমন কথা! কোনোভাবে ব্যবস্থা করতে হবে। তবুও কি নামায কাযা করার কোনো সুযোগ আছে? এভাবে আমাদের কত নামায কাযা হয়ে যায়। প্রথমত এমন সময় সফর করা উচিত, যাতে নামায কাযা না হয়। একান্ত এমন সময় সফর হলে যথাসাধ্য চেষ্টা করা, নামায যেন কাযা না হয়। পথে নামায পড়া নারীদের জন্য অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে অভিভাবকের সহায়তা থাকলে বিষয়টি অনেক সহজ হয়ে যায়।

দেখা যায় যাদের পিতা বা স্বামী নামাযের ব্যবস্থা করে দেন তারা সফরেও নামায আদায় করে। কিন্তু স্বামী বা পিতা যদি দায়িত্বশীল বা সচেতন না হন তাহলে নারীকে কি নিজে সচেতন হতে হবে না?

ঈমানের পরেই নামাযের স্থান, অথচ কারণে অকারণে আমরা এ বিষয়ে কত অবহেলা করছি! অন্যের কথা আর কী বলব! আমি নিজেই তো এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট অলস। উঠছি উঠছি করে ফজরে দেরি হয়ে যায়। কাজের ছুতোয় যোহর পড়ছি অনেক দেরি করে। আসরের নামায কখনো পড়ছি মাকরূহ ওয়াক্তে। আল্লাহ আমাকে নামাযে অলসতা থেকে রক্ষা করুন।

কুরআনের ঐ আয়াত মনে পড়লে বড় ভয় হয়! আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

"সুতরাং বড় দুঃখ আছে সেই নামাযীদের, যারা তাদের নামাযে গাফলতি করে।" (সূরা মাউন,১০৭ : ৪-৫)

আর দ্বীনদারির ক্ষেত্রে নারীর আত্মসচেতনতার জন্য সবচেয়ে বড় সহায়ক হল- দ্বীনী ইল্ম। নারী হোক পুরুষ হোক দ্বীনদারির উন্নতির জন্য দ্বীনী ইলমের কোনো বিকল্প নেই। এ জন্যই তো জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরয। কিন্তু আফসোস! আমরা নারীরা এই ফরয জ্ঞান অন্বেষণের ক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছি। এ বিষয়ে আমরা খুবই উদাসীন, খুবই গাফেল; সামান্য রিয়াযুস সালেহীন কিতাবটাও আমাদের অনেক নারীর পড়া নেই। নববী রা. এই কিতাবে মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত আয়াত-হাদীস সংকলন করেছেন। অন্তত এটা সকলেরই পড়া থাকা দরকার।

তবে দোষ শুধু নারীর নয়; পুরুষও এখানে সমানভাবে দায়ী। কারণ আল্লাহ তাআলা নারীকে পুরুষের অধীন করেছেন। নারীর সকল দায়িত্ব পুরুষের উপর ন্যস্ত করেছেন। তাই নারীকে প্রয়োজন পরিমাণ ইল্ম শেখানো পুরুষের দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর (জাহান্নামের) আগুন হতে...। **সূরা তাহরীম (৬৬) : ৬**

হাদীস শরীফে এসেছে-

জেনে রেখ, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।... পুরুষ তার পরিবারবর্গের বিষয়ে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। নারী তার পরিবার, সন্তান-সন্ততির বিষয়ে দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।...জেনে রেখ, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১৩৮

কিন্তু পুরুষ যদি নারীকে যথাযথ শিক্ষা না দেয় কিংবা শিক্ষার ব্যবস্থা না করে, তবে কি নারী দায়মুক্ত হয়ে যাবে? সে কি নিজে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করবে না? হ্যাঁ, চেষ্টা আমাদেরকে করতেই হবে; কারণ অন্যের দোহায় দিয়ে আমরা পার পাব না। যার যার হিসাব নিজেকেই দিতে হবে। আমি সহীহ পন্থায় চেষ্টা করলে আল্লাহ পথ খুলে দিবেন। নবীজীর জামানায় নারীরা ইল্ম অর্জন করেছেন। এমন কি তাদের আগ্রহ দেখে নবীজী তাদের জন্য আলাদা একটি দিন ধার্য করেছিলেন; যেদিন নবীজী তাদেরকে সময় দিতেন।

মোটকথা, দ্বীনী ইল্ম ছাড়া যেহেতু সচেতন দ্বীনদার হওয়া কঠিন, তাই দ্বীনী ইলম আমাদেরকে অর্জন করতেই হবে। এটি ফরয দায়িত্ব। একে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। আল্লাহ আমাদের দ্বীনী ইলম দান করুন; এজন্য সহীহ পন্থায় চেষ্টা-মেহনত করার তাওফীক দিন। দিনদারিতে আত্মসচেতনতা দান করুন।

সুলতানা পারভীন (মাসিক আল-কাওসার)

সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু কথা

সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় জেনে নিন-

১) একে অপরকে জানিয়ে দিন যে আপনারা পরস্পরকে ভালোবাসেন।

২) একই সময়ে দু'জন একসাথে রেগে যাবেন না।

৩) সমালোচনা যদি করতেই হয়, ভালোবাসা দিয়ে বলুন।

৪) পুরোনো ভুলগুলোকে তুলে আনবেন না।

৫) কোন তর্ক জিইয়ে রেখে ঘুমাতে যাবেন না, সমাধান করে নিন আগেই।

৬) একে অপরকে উপেক্ষা করার পরিবর্তে বরং গোটা দুনিয়াকে আগে উপেক্ষা করুন।

৭) দিনে কমপক্ষে একবার একসাথে সালাত আদায় করুন।

৮) মনে রাখবেন, সকল সফল স্বামী বা স্ত্রীর পেছনে একজন শ্রান্ত পরিশ্রমী জীবনসঙ্গী থাকে যে সবকিছু ভুলে একটানা কাজ করে যায় অপরজনকে সচল ও সতেজ রাখতে।

৯) মনে রাখবেন, ঝগড়া করতে দুই জনের প্রয়োজন হয়।

১০) আপনি যখন কোন ভুল করে ফেলবেন, তা স্বীকার করে নিন।

১১) দিনে অন্তত একবার আপনার জীবনসঙ্গী/জীবনসঙ্গিনীর প্রশংসা করুন কিংবা তাকে ভালোবেসে দয়ামাখা গলায় কথা বলুন।

১২) আপনার স্বামী/স্ত্রী বিছানায় যাওয়ার পর আপনি বিছানায় যেতে ১০ মিনিটের বেশি বিলম্ব করবেন না।

১৩) আপনার জীবনসঙ্গী যখন কিছু বলে, তা মন দিয়ে শুনুন।

১৪) মনে রাখবেন, আপনার স্বামী/স্ত্রী কিন্তু একটা ক্রিকেট বা ফুটবল ম্যাচ, মুভি, সিরিয়াল, ইউটিউব ভিডিওর চেয়ে বেশি মূল্যবান।

১৫) আপনার সঙ্গিনী/সঙ্গী যখন নতুন কোন পোশাক পরে তথবা তার চুল ভিন্নভাবে আঁচড়ায় তখন খেয়াল করুন।

১৬) আপনাদের বিবাহবার্ষিকী এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোকে স্মরণ রাখতে চেষ্টা করুন।

১৭) আপনাদের পক্ষ থেকে আপনার সঙ্গী কাউকে কোন উপহার দিলে বা কোন কাজ করে দিলে আপনার পক্ষ থেকে তাকে ধন্যবাদ দিন।

১৮) যিনি দেরিতে ঘুম থেকে উঠবেন, বিছানা গুছিয়ে রাখুন।

১৯) আপনার স্বামী/স্ত্রীকে যদি ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত দেখায় তবে তা লক্ষ্য করুন এবং তার জন্য কিছু করুন।

২০) আপনার জীবনসঙ্গী/জীবনসঙ্গিনীকে কখনো সমালোচনা করে আহত করবেন না এবং জনসমক্ষে কখনো তাকে অপমান করবেন না।

(রুকাইয়া ওয়ারিস মাকসুদের 'The Muslim Marriage Guide' বইটির ৬৫-৬৬ পৃষ্ঠার আলোচনার আলোকে রচিত)

যে ৮ টি বিষয় আপনার দাম্পত্য জীবনকে অশান্তিময়, দুর্বল এবং অকার্যকর করে থাকে

১) **খারাপ ব্যবহার করা :** তাকে এমন কিছু নিয়ে ঠাট্টা করা যাতে সে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এমন ধমক দেয়া যা অন্যদের সামনে তার অসম্মান হয়ে যায়। তাকে অপমান করা আপনার প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধকে কমিয়ে দিবে।

২) **উপেক্ষা করা :** তার পছন্দ, ভালোলাগা কিংবা তার কথাবার্তাকে গোণায় না ধরা বা পাত্তা না দেয়া। হয়ত সে সালাম দিয়েছেন আপনাকে, আপনি উত্তর দিলেন না। বেশ কিছুদিন যাবৎ খুব আগ্রহ নিয়ে হয়ত সে কিছু বলছে কিন্তু আপনি বিশেষ কারণ ছাড়াই তার কথার পাত্তা দিচ্ছেন না।

৩) **মিথ্যা বলা :** কিছুতেই মিথ্যা বলা সঠিক নয়। আল্লাহ মিথ্যাকে নিষিদ্ধ করেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে শয়তানের এই ওয়াসওয়াসা থেকে রক্ষা করুন। মিথ্যা আপনাদের পারস্পারিক বিশ্বাসকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিবে।

৪) **কথা দিয়ে কথা না রাখা :** কথা দিয়ে কথা রাখা বা ওয়াদা রক্ষা করা একজন মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। বিষয়টি দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রেও খুব গুরুত্বপূর্ণ।

৫) **এড়িয়ে চলা :** অনেকদিন পর দেখা হলে বন্ধুদেরকে বা ভাইদের আমরা জড়িয়ে ধরি, কোলাকুলি করি। আপনার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরতে পারেন না? পারবেন, অস্বস্তি লাগলেও তা ভেঙ্গে ফেলুন। ভালোবাসার প্রকাশ থাকা খুবই প্রয়োজন।

৬) **সন্দেহ ও গীবত করা :** কখনো সন্দেহ করতে যাবেন না। সন্দেহ সম্পর্ককে ধ্বংস করে। আপনার জীবনসঙ্গী আপনার খুব কাছের মানুষ এটা সত্যি। কিন্তু খুঁতখুঁত করে যদি তার বিষয়ে অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেন, আপনি নিঃসন্দেহে হতাশ হবেন। মানুষ কখনো নিখুঁত নয়। আর মনে রাখবেন, প্রত্যেকে তার নিজ নিজ হিসাব দিবে। তাই সন্দেহ দূর করুন। স্বামী বা স্ত্রী একে অপরের চাদরস্বরূপ, ছোট-খাটো ভুলত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে অন্যদের কাছে বলে বেড়াবেন না, গীবত করবেন না।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ বলেছেন :

"হে মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।" -- [আল হুজুরাত, ৪৯ : ১২]

৭) **খুব বেশি ব্যস্ততা :** অপরজনের জন্য কিছু সময় রাখবেন। পারস্পরিক কথাবার্তা আর সময়গুলো সম্পর্ককে প্রগাঢ় করে। তার প্রতি আপনার কর্তব্য রয়েছে, আপনার কিছু দায়িত্ব রয়েছে। কিছুটা সময় তিনি পাওয়ার অধিকার রাখেন। এই বিষয়টি খেয়াল রাখুন।

৮) **নামাজ এবং অন্যান্য ইবাদাত না করা :** যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদাত না করে, নামাজ না পড়ে এবং আল্লাহর নির্দেশিত পথে না চলে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট নন। নিয়মিত নামাজ না পড়া, অশ্লীল কাজ, হারাম উপার্জনগুলো থেকে সরে না আসার কারণে অনেক সংসার ভেঙ্গে গেছে।

আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালনে অলসতা-উপেক্ষা করার কারণে মুসলিম সংসারে অত্যন্ত দ্রুত ভাঙ্গন ধরে যায়।

আল্লাহ আমাদেরকে ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন এবং আমাদের সরল সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমাদের পরিবারগুলোতে রাহমাত এবং বারাকাহ দান করুন।

dampotto.blogspot.com/

মাসতুরাতের উদ্দেশ্যে তিনটি কথা

প্রথম কথা : আল্লাহ তাআলা মাকে সন্তানের মাদরাসা বানিয়েছেন। মায়ের কোল সন্তানের মাদরাসা। তাবলীগের বড় মুরুব্বী হাজী আব্দুল মুকীত রাহ.-এর জামাতা প্রফেসর ড. আনওয়ারুল করীম সাহেব একবার হযরতজী এনামুল হাসান ছাহেব রাহ.-কে জিজ্ঞেস করলেন, হুযুর! এখন এত মাদরাসা, দ্বীনী তালীমের এত সুযোগ-সুবিধা, এরপরও নতুন প্রজন্ম খারাপ কেন, ওদের মধ্যে ভালো কম কেন? সাহাবায়ে কেরামের যামানায়, তাবেঈ-তাবে তাবেঈর যামানায় তো এত মাদরাসা ছিল না, তবু সেই যামানার সবাই ভাল, সব ছেলে ভাল। এখন কেন খারাপ? এত মাদরাসা সত্ত্বেও কেন ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ভালোর সংখ্যা কম?

সম্ভবত হযরতজী বললেন, আরে! তখন মাদরাসা ছিল বেশী এখন মাদরাসা কম! এখন তো তুমি ছয়/সাত বছর বয়সে সন্তানকে মাদরাসায় পাঠাও, ভর্তি করাও। সে এক মাদরাসায় পড়ে, যতক্ষণ মাদরাসায় থাকে ততক্ষণ শুধু মাদরাসা। আর আগে সন্তান যেদিন ভূমিষ্ঠ হত সেদিন থেকে প্রতিটি মুহূর্তই হতো তার মাদরাসা, প্রতিটি কোলই ছিল তার একেকটি মাদরাসা। মায়ের কোলে আছে তো মাদরাসায় আছে। বোনের কোলে আছে তো আরেক মাদরাসায় আছে। ভাই কোলে নিয়েছে তো সে মাদরাসাতেই আছে। তখন সন্তান দুনিয়াতে আসার পর যার কোলে যাক যে দিকে তাকাক, যার হাতে যাক যে দিকে বের হোক- সবখানে মাদরাসা আর মাদরাসা। অর্থাৎ সে যেখানেই যাবে যার কাছেই থাকবে সে দ্বীনদার পাবে, দ্বীনী পরিবেশ পাবে।

যে বোনের কোলে আছে, সে বোন মিথ্যা বলে না, কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করে না। ভায়ের কোলে গেল তো ভাই-ও ভদ্র ছেলে, নামাযী, কারো গীবত-শেকায়েত করে না। বাবা এসেছেন, তার কোলে গেল, তিনিও ভাল, তার কামাই হালাল, দুনিয়ার পিছে পড়ে নামায ছাড়েন না। ধন-সম্পদ গড়ার জন্য হারামে লিপ্ত হন না। তার মানে, সন্তান যার কোলে যাচ্ছে যার কাছে যাচ্ছে মাদরাসায় যাচ্ছে! আর এখন? কোথায় সেই মাদরাসা?

সন্তান যেখানে যাবে যার কোলে থাকবে, সেখানেই যদি আগের মত মাদরাসা হতো, তাহলে তো ভাল ছিল। কিন্তু তা যদি না হয়, অন্তত প্রত্যেক সন্তানের প্রথম কোলটি যেন হয় মাদরাসা। যিনি এ সন্তানকে ধারণ করছেন, বহন করছেন দশ মাস দশ দিন, তাঁর আখলাক যদি ভাল হয়, তাঁর

মধ্যে যদি দ্বীন-ঈমান থাকে, নামায থাকে কুরআন থাকে, ভাল ব্যবহার থাকে, তবে সন্তানের উপর এর প্রভাব পড়বেই পড়বে। প্রত্যেক নারীকে বুঝতে হবে, আপনার ব্যক্তি-সত্তাই আপনার সন্তানের মাদরাসা। আপনিই আপনার সন্তানের প্রথম মাদরাসা। আপনি ভাল সন্তান ভাল, আপনি খারাপ সন্তান খারাপ। হয়ত বলবেন, মা অনে-ক ভাল, সন্তান খারাপ- এমনও তো দেখা যায়! আসলে এমনটা খুব কম হয়। হলেও পরে ঠিক হয়ে যায়। আরেক কথা হল, মা যে অনেক ভাল, আমরা তাঁর বাহ্যিক অবস্থা দেখে সুধারণা করছি। কিন্তু মার তো নিজের হিসাব নিজে নেওয়া দরকার, আমি কতটুকু ভাল। নিশ্চই আমার কোনো ত্রুটি আছে, মানুষ জানে না, কিন্তু আল্লাহ জানেন। আমাকে আমার সেই ত্রুটি সংশোধন করতে হবে।

আমরা ছেলে-মেয়েদের শাসন করি কথা দিয়ে, হাত দিয়ে। বেশি ভাল হলে হয়ত হাত ব্যবহার করি না, শুধু কথা দিয়ে শাসন করি। কিন্তু সন্তানের শাসন-পদ্ধতি কি শুধু হাত আর মুখ ব্যবহার? বকাঝকা করা আর লাঠি হাতে নেওয়া? আসলে এভাবে শাসন হয় না। মূলত সন্তান শাসনের প্রথম কথা হল আমি ভাল হওয়া, এক নম্বরে আমি ভাল হওয়া। আমার আমল-আখলাক, আমার আচার-ব্যবহার, চিন্তা-চেতনা ভাল হওয়া। বাপের রোজগার হালাল হওয়া। এ হল সন্তান শাসনের মৌলিক কথা। মা-বোনদের প্রতি নসীহত, আপনারা স্মরণ রাখবেন, আপনারা হলেন সন্তানের প্রথম মাদরাসা। প্রথম থেকেই মাদরাসা। আপনি যতদিন বেঁচে থাকবেন সন্তান আপনার কাছ থেকে শিখতে থাকবে। কাজেই আপনারা আপনাদের যত্ন নিন।

দ্বিতীয় কথা : সময়ের অপচয়। এটা গুনাহ, স্বতন্ত্র গুনাহ। যদিও আমাদের সকল কাজ সময়ের সাথে বাঁধা। আমরা সময়ের উর্ধ্বে উঠে কোনো কাজ করতে পারি না। কিন্তু যদি সময়ের উর্ধ্বে উঠে কোনো গুনাহের কাজ করা যেত তবে কি ঐ গুনাহর কাজ গুনাহ হতো না? অবশ্যই হত। বোঝা গেল, গুনাহের কাজ এমনিতেই গুনাহ আর সময়ের অপচয় আলাদা গুনাহ। সময়কে কোনো কাজে না লাগানো বা হেলায় নষ্ট করা ভিন্ন একটা গুনাহ। সকল শ্রেণীর মানুষ এখন এই গুনাহে লিপ্ত। সময়-অপচয়-রোগে আমরা সবাই আক্রান্ত। আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার ধারণা, মহিলাদের মধ্যে এ সমস্যাটা বেশি।

তাদের সময় বিভিন্নভাবে অপচয় হয়। একটা হল সাংসারিক কাজ। বলতে পারেন, এটা তো বড় কঠিন কথা, কাজের মধ্যে থাকলে আবার সময়ের অপচয় হয় কীভাবে! আমি বলি, ফজর থেকে

মাগরিব পর্যন্ত কাজ? গ্রামের মহিলাদের সারাদিন কাজ আর কাজ। সারাদিন কেন কাজ? কোথায় আপনার একটু আরাম-বিশ্রাম, তালিম-তিলাওয়াত, নফল নামায, যিকির-আযকার? আসলে আমরা কাজ অনেক করি বটে, কিন্তু সুশৃঙ্খলভাবে করি না। রুটিন মোতাবেক করি না। অনেক সময় কাজ ফেলেও রাখি, সময় মতো করি না। ফলে আমাদের সময়ে বরকত হয় না। অপচয় হয়ে যায় বহু সময়। এজন্য প্রত্যেক ঘরে মহিলারা সময়সূচি বানিয়ে নিবেন।

রুটিন মাফিক কাজ করলে দেখবেন অনেক সময় বেঁচে যাবে। আপনি রুটিনে তালিম-তেলওয়াতের জন্য সময় বরাদ্দ রাখুন। নফল নামাযের জন্য সময় বের করুন। আরাম-বিশ্রামের জন্য সময় খালি করুন। ঠিকমতো বিশ্রাম না নেওয়ার কারণে মহিলাদের শারীরিক কত সমস্যা হয়। আপনি ঠিক করুন, ঠিক কতটা থেকে কতটার মধ্যে নাশতা প্রস্তুত করবেন, বাচ্চাদেরকে মাদরাসায় কখন পাঠাবেন। দুপুরের রান্না কখন শুরু করবেন কখন শেষ করবেন। আপনার কাজ যদি সময় মতো হয়, গোছালো হয়, অলসতা না করে যদি সব কাজ সময় মতো করে ফেলতে পারেন, তাহলে আপনি ইবাদত-বন্দেগী ও দ্বীনী কাজের জন্য অনেক সময় বের করতে পারবেন। আর না হয় কাজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে এবং পুরোটা দিন শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আপনি একটু আরাম-বিশ্রামেরও সময় পাবেন না।

আপনি লক্ষ্য রাখুন, যেন কম থেকে কম সময়ে বাচ্চাদের খাওয়া-গোসল ইত্যাদি হয়ে যায়, সেভাবে ওদের গড়ে তুলুন। স্বামীরা স্ত্রীদের সময় বাঁচনোর প্রতি লক্ষ রাখুন। নিজের খাওয়ার বর্তনটা স্ত্রীর ধোওয়ার জন্য রেখে না দিয়ে নিজেই ধুয়ে ফেলুন। দস্তরখান বিছানো-গুটানোর ক্ষেত্রে স্ত্রীকে সহায়তা করুন। সময় হলে ঘরের অন্যান্য কাজে অংশ নিয়ে স্ত্রীর কাজ এগিয়ে দিন। এটা পুরুষের দায়িত্ব। পুরুষের উদ্দেশ্যে যখন কথা বলবো তখন এ-বিষয়ে আরও বলা যাবে। আজ তো মহিলাদের উদ্দেশ্যে বলছি। সুতরাং ঘরওয়ালি হিসাবে যে কাজের দায়িত্ব আপনি নিজের কাঁধে নিয়েছেন, যে কাজ আপনি করবেনই, সে কাজ সময় মতো করুন। উদ্যমের সাথে করুন। তাহলে আপনি দ্বীন শেখার জন্য সময় বের করতে পারবেন। ইবাদত-বন্দেগীতে অগ্রসর হতে পারবেন।

ছোটকালে আমি আমার মার সঙ্গে রান্না ঘরে যেতাম। একদিন তিনি আউয়াল ওয়াক্তে যোহর পড়ে রান্না করতে এলেন। কী কারণে যেন আগুন ধরতে দেরি হচ্ছিল। লক্ষ্য করলাম, তিনি দোয়া পড়ছেন আর কেঁদে কেঁদে বলছেন, আহারে! নামাযের সময় বুঝি যায়! নামাযের সময় বুঝি যায়!

আমি বললাম, এই না আপনি যোহর পড়ে এলেন, নামাযের সময় তাহলে যায় কোথায়? বললেন, 'আসরের সময় চলে যায়!' অর্থাৎ এই যে আগুন জ্বলছে না, রান্না শুরুই হচ্ছে না, দেরি হয়ে যাচ্ছে, রান্নার নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে তো আমি আসরের নামায আওয়াল ওয়াক্তে পড়তে পারবো না। চিন্তা করুন, এইমাত্র যোহর পড়ে এলেন, কিন্তু আগুন জ্বলতে একটু দেরি হচ্ছে বলে এখনই তাঁর আসরের সময় চলে যাচ্ছে!

আমরা সাধারণত দশটা উনষাট মিনিট হয়ে গেলেও এগারটা বাজেনি মনে করি। কিন্তু আমার আম্মা ঘড়ির কাঁটা দশটা পার হলেই বলতেন এগারটা বেজে গেছে। আসলেও তাই। দশটার পরের মিনিটগুলো এগারটার মিনিট দশটার নয়। আর এগারটা বাজার পর যে মিনিট সেটা তো এগারটার নয়, বারটার মিনিট!

তৃতীয় কথা : স্বামীর সাথে ভাল আচরণ। স্বামী যারা, তাদেরকে আদর্শ স্বামী হওয়ার জন্য যা জানা দরকার, প্রশিক্ষণ নেওয়া দরকার, তা তো আমরা নিইনি। স্বীকার করছি, আমরা আদর্শ স্বামী হতে পারিনি। আদর্শ স্বামীর গুণাবলী আমরা শিখিনি। ইসলাম কিন্তু খুব শিখিয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব ক্ষেত্রেই আমাদের জন্য আদর্শ। তাঁর আদর্শই তো আদর্শ। কিন্তু নবীজীর সীরাত থেকে আমরা আদর্শ স্বামীর সেই গুণাবলী হাসিল করতে পারিনি। আমরা ভাল স্বামী নই, আমরা 'আসামী'। এখন যেহেতু নারীদের উদ্দেশ্যে কথা বলছি সে জন্য ঐ প্রসঙ্গে আর যাচ্ছি না। মা-বোনদের বলছি, আমরা যেন আমাদের আচরণ সুন্দর করি। আচরণ সুন্দর করার অনেক দিক আছে। সব তো আর এক মজলিশে বলা সম্ভব নয়। বলার দরকারও নেই। আপনারা মনিতেই জানেন। আমি শুধু সওয়াব হাসিলের জন্য একটি কথা তুলে ধরছি। যে কথা হাদীসেও এসেছে।

'কখনও, কোন সময়, সব সময়' এই শব্দগুলো বিরক্তির সময় আমরা ব্যবহার করি। স্বামীর আচরণ একটু খারাপ লাগলেই বলে উঠি, তুমি 'সব সময়' আমার সাথে এমন কর। এখানে 'সব সময়' শব্দটা অপাত্রে ব্যবহার হয়েছে। আসলেই কি সব সময় আপনার স্বামী আপনার সাথে এমন করে? স্বামীরা বাহিরে বাহিরে থাকে। স্ত্রীদেরকে সময় কম দেয়। স্ত্রী এক দিন সময় চাইলেন। স্বামী ব্যস্ততা দেখালেন আর অমনি স্ত্রী বলে উঠলেন, 'কখনও তোমার কাছে একটু সময় পাই না! কোনো দিন তুমি আমাকে সময় দাও না।' এই যে পাইকারি বলা, 'সব সময় তুমি এরকম কর, কখনও তোমার কাছে একটু ভাল ব্যবহার পাই না, কোনো সময় তোমার কাছে একটা জিনিস

চাইলে পাই না।'- এই ভাষাগুলো ঠিক না। হাদীসে এসেছে, গড়পড়তা নারীদের অভ্যাস হল, একটুতেই তারা স্বামীদের সব অনুগ্রহ ভুলে যায় এবং বলে উঠে,

'তোমার কাছে কখনও ভাল ব্যবহার দেখলাম না!' আহারে! কিচ্ছুই দেখেননি? এটা কীভাবে হয়! কিছু না কিছু দেখেছেন, অবশ্যই দেখেছেন! তাহলে এরকম করে বলার কী দরকার। এমন কথা স্ত্রী বললে স্বামীর মনে আঘাত লাগে, তিনি বড় কষ্ট পান। স্বামী বললেও স্ত্রীর মন ভেঙ্গে যায়, তিনি ভীষণ আঘাত পান।

উর্দুতে এজাতীয় একটি শব্দ হল হামেশা। মুফতি রফী উসমানী সাহেব হুযুরের বয়ানেও কথাটা আছে। একদিন তরকারিতে লবণ একটু কম হল, আপনি ক্ষেপে গিয়ে বলে উঠলেন, 'সব সময় তরকারিতে লবণ কম হয়, রান্না একটা দিনও খাওয়ার মত হয় না।' ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন... একটা দিনও কি তরকারি খাওয়ার মত হয় না? আরে ভাই আপনি বলতে পারেন, সব সময় তো স্বাদ হয়! আজ বুঝি লবণটা কম হয়ে গেছে! আর এটাই বা বলার কী দরকার। ওরা কি খাওয়ার সময় বিষয়টা বুঝবে না? হাফেজ্জী হুযুর রাহ.-এর ঘটনা শুনেছি, লবণ মোটেই দেয়া হয়নি এমন তরকারি হুযুর বিনাবাক্যে খেয়ে মাদরাসায় চলে গেলেন, কিছুই বলেননি। অন্যরা খেতে বসে তো আশ্চর্য! হুযুর তো কিছুই বললেন না। হুযুর তো কিছুই বললেন না! -আমাদেরকেও এমন হতে হবে। এ জাতীয় কথা পরিহার করতে হবে। আমরা বরং প্রশংসা করব, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। তাহলে স্ত্রীরা আমাদের কাছে শিখবে। স্ত্রীরা করলে স্বামীরা শিখবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে শেখার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আরেকটি কথা আরজ করছি। আগের যামানার মহিলা আর এ যামানার মহিলাদের মাঝে বিশেষ একটি পার্থক্য আছে। 'রিসালাতুল মুস্তারশিদীন' কিতাবে আমি পড়েছি। ইহইয়াউ উলূমিদ্দীনসহ আরও অনেক কিতাবে কথাটা আছে। আগে যখন স্বামীরা রোজগারের জন্য ঘর থেকে বের হতেন, তখন স্ত্রীরা বলত, আপনি আমাদের জন্য কামাই করতে যাচ্ছেন, সংসার চালানোর জন্য রোজগার করতে বের হচ্ছেন, আমরা আপনাকে আস্বস্ত করছি যে, আমরা দারিদ্র্যের উপর সবর করতে রাজী, ক্ষুধার কষ্ট সইতে প্রস্তুত, আজ এটা নেই কাল ওটা নেই, অভাব-অনটন চলছেই চলছে...এর উপর আমরা ধৈর্য ধরব। কিন্তু জাহান্নামের আগুন সহ্য করতে পারব না। সুতরাং হালালভাবে যা পাবেন কেবল ততটুকু আনবেন, হারাম কিছু আনার

চেষ্টা করবেন না। আমরা না খেয়ে কম খেয়ে থাকতে পারব কিন্তু দোযখের আগুন সইতে পারব না।

এই ছিল আগের কালের মহিলাদের ভাষা। আর এই যামানার মহিলারা স্বামীর হাতে লম্বা তালিকা ধরিয়ে দিয়ে বলে, এগুলো আমার চাই। তালিকা দেখে স্বামী বেচারা বিমর্ষ হয়ে পড়ে। স্ত্রীকে অনুনয় করে বলে, আমি এত কিছু কীভাবে আনব, আমার আয় তো তোমার সামনে? তুমি তো জান আমার কত আয়! স্ত্রীর এক কথা; তোমার কত আয় আমার তা জানার দরকার নেই। এই জিনিসগুলো আমার চাই, এগুলো ছাড়া দিন চলবে না। এই যুগে এমন মহিলা অনেক। কিন্তু আগে এমন ছিল না। কম হোক আপত্তি নেই, কিন্তু হারাম তারা সহ্য করতেন না। আল্লাহ তাআলা সকল মহিলাদেরকে এমন হওয়ার তাওফীক দান করুন। পুরুষদেরও আগের পুরুষদের মত নেককার হওয়ার তাওফীক দিন। আমীন।

মাওলানা আব্দুল মালিক সাহেব (মাসিক আল-কাওসার)

পুরুষেরা আসলে কি চায়?

যখন একজন মুসলিম পুরুষ বিয়ের জন্য পাত্রী খোঁজেন তখন কোন জিনিস গুলো তার মনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়?

একটা কঠিন প্রশ্ন। কারণ যেটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাওয়ার কথা সেটা হল রাসুলুল্লাহ (স) যেটা শিখিয়ে দিয়েছেন, যেমন একজন ধার্মিক নারী।

কিন্তু এ সমাজে বেড়ে ওঠার সাথে সাথে আমরা মিডিয়াতে যেভাবে নারীকে উপস্থাপিত হতে দেখি, সেটা আমাদের জীবন সঙ্গী সংক্রান্ত চিন্তাগুলোকে প্রভাবিত করে। সুতরাং বাস্তবে প্রায় সব পুরুষই যখন তার জন্য একজন জীবন সঙ্গীকে খুঁজতে যান, তখন প্রথম যে জিনিসটি তাদের মাথায় আসে সেটা রাসুলুল্লাহ (স) যেটা আপনাকে শিখিয়ে দিয়েছেন সেটা অবশ্যই নয়। সুতরাং অবশ্যই আপনি যখন পার্টনার খোঁজেন তখন শারীরিক ভাবে একজন আকর্ষণীয় নারীকেই খোঁজেন। এটাই প্রথম যা আপনার মনে স্থান পায়।

আপনি যাকে পছন্দ করেন তাকে অন্য সবাই আকর্ষণীয় হিসেবে ভাবতে নাও পারে। কিন্তু আপনার চোখে তাঁকে শারীরিক ভাবে আকর্ষণীয় হিসেবে উপযুক্ত হওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যবশত পুরুষরা যা ই বলেন না কেন প্রায় সবাই সব কিছুর আগে শারীরিক সৌন্দর্যের দিকেই ঝুঁকে থাকেন।

কিন্তু আমি এটাকে খারাপ বলে মনে করি না। বরং আপনাকে অন্য বিষয়গুলোর প্রতিও গুরুত্বারোপ করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে একজন পুরুষ যদি দশজন আকর্ষণীয় নারীকে দেখেন, তাহলে তাদের মধ্য থেকে তাঁকে রাসুলুল্লাহ (স) এর শিক্ষা অনুযায়ী উপযুক্ত জনকে বেছে নিতে হবে।

তার মানে, মূলত যদি কেউ সুন্দর হয় কেবল তখনই শুধু আপনি তার ধর্মীয় গুনাবলীর দিকে গুরুত্ব দিবেন?

(হাসি!) হ্যাঁ! পাগলামিই বটে তাই না! না! আমি মনে করিনা যে এটা পাগলামি। আমি মনে করি এটাই স্বাভাবিক। অবশ্যই আপনি কিছু ধার্মিক নারীর মধ্য থেকে সবচেয়ে সুন্দরী একজন কে বেছে নিতে পারেন।

তবে সেটা কিন্তু ঘটে না, সাধারণত আমরা (মেয়েরা) চাই সবাইই (ছেলেরা) ধার্মিক হোক। কিন্তু অনেক ছেলেদের ক্ষেত্রে কি ঘটে? যখন তারা একজন সুন্দরী নারীকে দেখে তারা জাস্ট আশা করে যে মেয়েটি ধার্মিক হবে। যদি সে ধার্মিকতাকেই প্রাধান্য দেয়ার প্রতি মনস্থ করে, তবুও সুন্দরী নারীর সাক্ষাৎ তাকে তার স্ট্যান্ডার্ডটাকে (ধার্মিকতার দিক থেকে) কমিয়ে দেয়, সে ধার্মিকতার দিকটায় ছাড় দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। সে ভাবতে থাকে যে সে মেয়েটিকে রিলিজিয়াস বানিয়ে নিতে পারবে।

সুতরাং ধার্মিকতাটা যেহেতু এক ধরণের অদৃশ্যমান ব্যাপার সেহেতু আপনি কি এটা নিয়ে বড়জোর আশাই করতে পারেন?

না! কারণ ধার্মিকতাটা অদৃশ্য কোনও ব্যাপার নয়। আমি মনে করি এক দিক দিয়ে এটা অদৃশ্যমান ব্যাপারও বটে, যেমন একজন মানুষের হৃদয়ের অকৃত্রিমতা, এটা কিন্তু অদৃশ্য ব্যাপার। কিন্তু অনেক পুরুষই যেটা করতে চেষ্টা করেন সেটা হল, তারা ভাবেন যে একজন সুন্দরী নারী মোটামুটি ধার্মিক হলেই বিয়ের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু তাদের জীবন অবশেষে একধরনের শূন্যতায় ভরে থাকে। তারা নিজদেরেকে বুঝায় "মেয়েটির মধ্যে সম্ভাবনা আছে" কিন্তু বাস্তবে সেটা আর ঘটে না, তখনি থমকে যান তারা পরিণত হন অতি কচলানো লেবুর মতো।

আসলে এটা হতে বাধ্য, কারণ তারা ধার্মিকতার ব্যাপারে আপোষ করেছেন এবং সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এখন তাদেরকে সেটার উপরই কাজ করতে হবে। অতি-কচলানো লেবুর সাথে চিনি মিশিয়ে তাকে সুমিষ্ট বানানোর প্রচেষ্টা। পুরুষের পুরুষত্ব বাচক অহংবোধ নিজের ভুল গুলো স্বীকার করার চাইতে তাকে নিজের পছন্দমত সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবিত করবে।

কিন্তু আমরা যদি মুল প্রশ্নে ফিরে যাই, যে পুরুষরা আসলে কি চায়? সাধারণত আপনারা এমন নারী কে চান যে স্বাস্থ্য সচেতন এবং সে তার নিজের টেক কেয়ার করতে পারবে, যে তার শারীরিক অবয়বের প্রতি যত্নশীল হবে। আপনারা এমন কাউকে পছন্দ করবেন না যে দৃশ্যত কেয়ারই করে না কিছু। মানুষ তথা পুরুষ ও নারী উভয়েই স্বভাবতই দীর্ঘায়ুর প্রতি আসক্ত যাতে তারা সন্তান নিতে পারে এবং সুখী ও স্বাস্থ্যকর জীবন-যাপন করতে পারে।

নিচের প্রশ্নোত্তর গুলোতে পুরুষরা কি চায় তা ফুটে উঠেছে...

আপনার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলুন? আপনি একজন ধার্মিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে কি কি জিনিস গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন?

একজন সাথী... এমন একজন যিনি সংসারকে রাসুলুল্লাহর (স) সুন্নাহর সাথে টিকিয়ে রাখবেন। কিন্তু সুন্নাহ বুঝার ক্ষেত্রে সম-মনষ্ক হওয়া ও ইমানের মৌলিক ভিত্তিটায় মিল থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আপনার বিয়ে এবং ভবিষ্যতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ-কর্মকে আপনি সেই ভিত্তিটার উপরেই সাজাবেন।

এখন এমন একটা প্রশ্ন করবো যা সম্পর্কে অধিকাংশ নারীরাই সচেতন: শারীরিক অন্তরঙ্গতা ও উপভোগ্যতার পাশাপাশি কোন জিনিসটিকে আপনি বিয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন?

স্ত্রীর কাছে সবচেয়ে অভূতপূর্ব যে জিনিসটি একজন পুরুষ চাইতে পারে তা হল স্ত্রীর সহচর্য, সুন্দর চরিত্র, এবং সঠিক ভাবে সন্তানাদিকে প্রতিপালন করা। একজন পুরুষ হিসেবে আপনি বাইরে কাজে যাবেন পরিবার চালানোর জন্য। সুতরাং যখন আপনি কাজের জন্য বাইরে থাকেন তখন ঘরে এমন এক নারী থাকা যে কিনা আপনার সন্তানাদিকে শিক্ষা দিচ্ছে এবং প্রতিপালন করছে এটা সবচেয়ে বড় চাওয়া-পাওয়া গুলোর মধ্য অন্যতম।

সহচর্য বলতে আপনি কি বুঝেন?

এটা এমন, যে যখন আপনার একজন ভাই কিংবা বোন থাকে, যার সাথে আপনি বেড়ে উঠেন। এমনই একটা কিছু। যে সব সময় পাশে থাকে। আপনি যা কিছু করেন সে সবই পছন্দ করবে এমন না, কিন্তু আপনি যা করেন তা সে উপভোগ করে, কারণ একটাই, সেটা হল যে আপনি এটা করছেন। যেমন আমার স্ত্রী কিছু খাবার খেতে শুরু করার আগে আমি সেগুলো পছন্দ করতাম না। তাঁকে দেখে আমি সেগুলো পছন্দ করতে শুরু করি, আমি চিন্তা করলাম ট্রাই করে দেখিনা কেন? এটাই সত্যিকার সহচর্যের সবচেয়ে উপভোগ্য দিক। এমন কিছু জিনিস কে পছন্দ করা, কারণ আপনার প্রিয়জন সেটা পছন্দ করে। যখন আপনি আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সাথে কিছু করেন তখন কিছু কাজ যেমন একসাথে খাওয়া এমনকি একসাথে রান্না করাটাও অনেক উপভোগ্য হয়ে উঠে।

তাহলে নারীর ব্যক্তিগত অর্জনের ব্যাপারটা কেমন? এটা কি পুরুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

এই ব্যাপারটিতে পুরুষদের মধ্যে সব রকমের মতামতই পাওয়া যায়। কেউ চায় এমন নারী যার অর্জন (শিক্ষা, প্রফেশনাল এচিভমেন্ট ইত্যাদি) খুব ভালো। কেউ এমন নারী চায় যাকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। কেউ চায় এমন নারী যার কোনও উচ্চাভিলাষ (ambitions) নেই। এটা হচ্ছে পুরুষের দুর্বলতা, কারণ রাসুলুল্লাহ (স) পরিবারে নিয়ন্ত্রক ছিলেন না এবং তার স্ত্রীগন ছিলেন খুবই উচ্চাভিলাষী (ambitious)। যদি আমরা হযরত আয়িশা (রা) ও খাদিজা (রা) এর দিকে তাকাই আমরা তাদের মধ্যে উচ্চাভিলাষের অভাব দেখি না। তারা খুবই বুদ্ধিমতী ও সুদক্ষ ছিলেন।

কিন্তু কেন পুরুষরা উচ্চাভিলাষহীন স্ত্রী চাইবে?

সম্ভবত তারা এটা করে নিজেকে শক্তিশালী ভাবতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমি এই মানসিকতাটা বুঝতে পারি না। আমার বেলায়, আমি চাই যখন আমি ঘরে ফিরি তখন আমার স্ত্রী ঘরে থাকবে আমাকে সম্ভাষণ জানানোর জন্য। সে আমার দেখ-ভাল করে এটা আমি ভালবাসি এবং এটা পুরুষের অন্তরাত্মায় প্রশান্তি এনে দেয়। এটা আমাকে শক্তি যোগায় যে আমার স্ত্রী আমাকে সম্মান ও ভালোবাসার পাত্র হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং সেটা প্রকাশ্য কাজের মাধ্যমে ব্যক্ত করছে। এটা পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্মানের সৃষ্টি করে।

আপনি কি মনে করেন যে আপনার স্ত্রী তার অর্জনের/সফলতা/ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে কি করলো বা না করলো সেটায় আসলে তেমন কিছুই আসে যায় না? তবে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল সে আপনার জন্য কি করছে সেটা?

না, সবার জন্য ব্যাপারটা সমান না। অনেকে তার স্ত্রীর সফলতা বা অর্জন দেখে খুশি হয় এবং তারা খুব হেল্পিং হয়। বিশেষ করে তার স্ত্রী যেটা করছে সেটা যদি মুসলিম কমিউনিটির জন্য ভালো কিছু হয়।

আপনি যখন অফিস বা কাজ শেষে ফিরেন এবং ঘরে প্রবেশ করার জন্য দরজা খোলার মুহূর্তে কোন জিনিসটির জন্য আপনি মুখিয়ে থাকেন?

পুরুষেরা সাধারণত উত্তর দেয় যে "ঘরে ফিরে আমি হাসিমুখে সম্ভাষণ পেতে পছন্দ করি। আমি এসে ঘরটা গোছালো ও সুন্দর ঘ্রানময় দেখতে পছন্দ করি। আমি দেখতে চাই আমার স্ত্রীকে খুব

সুন্দর দেখাচ্ছে, আমি তার মধ্যে সুন্দর পারফিউমের গন্ধ পেতে চাই। আমি ঘরে ফিরে রিল্যাক্সে থাকতে চাই। আমি ঘরে ফিরে আমার স্ত্রীকে কুরআন পাঠরত দেখতে পছন্দ করি। ঘরে ফিরে আমার স্ত্রীকে তার পছন্দের কাজে নিমগ্ন দেখতে পছন্দ করি।"

নারীর ভূমিকার ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন?

অনেকেই এটা বলতে বুঝে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, এবং রান্না-বান্নাকে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, নারীর ভূমিকা বলতে আমি কখনও এমনটি ভাবিনি। তবে অবশ্যই একজন ভালো নারী রান্নাটা ভাল করবে। আপনাকে সুখী করতে সে স্বাস্থ্যকর খাবার রান্না করবে। কিন্তু আমি মনে করি না যে নারীর ভূমিকার জায়গাটা এটাই। আমি নারীকে সঙ্গী হিসেবেই দেখি। ব্যক্তিগতভাবে আমি রান্না করা পছন্দ করি। আমি এটা খুবই উপভোগ করি তাই আমিও রান্না করি।

আপনার মতে বিয়ের ক্ষেত্রে নারীদের সবচেয়ে বড় ভুলটি কি বলে আপনি মনে করেন?

আসলে আমি মনে করি এটা এভাবে বলা গুরুত্বপূর্ণ যে "মানুষ (শুধু নারী নয়) সবচেয়ে বড় যে ভুলটি করে", এর মধ্যে নারীও অন্তর্ভুক্ত। আমি মনে করি ভুলটা হল আমরা অপরজনকে এমন ভাবে দেখি যেন সে একই জেন্ডারের মানুষ।

এ ব্যাপারে পুরুষদের ভুলের উদাহরণ কি হতে পারে?

পুরুষরা নারীদেরকে নিজেদের মতো করে ভাবতে আশা করে। পুরুষদের মধ্যে সোজাসাপ্টা মুল কথায় আসার একটা প্রবণতা কাজ করে অন্যদিকে মেয়েরা চায় তার কথাগুলো কেউ শুনুক। এটা সবারই জানা। ছেলেরা সবসময় মেয়েরা কথা বলার সময় মন্তব্য করে বসে, যেখানে তাদের শুধু শুনে যাওয়া উচিৎ। কিন্তু তারা সবকিছুর সমাধান দেয়ার চেষ্টা করে এবং প্রত্যেকটি সমস্যাকেই আক্রমণ করে থাকে।

নারীদের ভুল সম্পর্কে কি বলবেন?

জাস্ট পুরুষের বিপরীতটা। নারীরা অন্যান্য নারীদের ব্যাপারে যেভাবে চিন্তা করে পুরুষদের সম্পর্কেও সেভাবেই চিন্তা করে। আর পুরুষরাও যেভাবে অন্যান্য পুরুষদের ব্যাপারে চিন্তা করে সেভাবেই নারীদের ব্যাপারে চিন্তা করে। কারণ আমরা শুধু আমাদের ব্যাপারেই অভিজ্ঞ, যেমন

মেয়েরা মেয়েদের ব্যাপারেই শুধু অভিজ্ঞ। আসলে মেয়েদের উচিৎ ছেলেদের ক্ষেত্রে ছেলেদের জায়গা হতে চিন্তা করা আর মেয়েদের উচিত ছেলেদের ক্ষেত্রে ছেলেদের জায়গা থেকে চিন্তা করা।

মূল: উম্মে যাকিয়্যাহ, অনুবাদ: মুনির মুহাম্মাদ, সোর্সঃ onislam.net

স্বামীর যেসব গুণাবলীর কারণে স্ত্রীরা তাদের ভালোবাসেন

আমরা জানি,আমাদের মাঝে সে ব্যক্তি ভালো যে তার স্ত্রীর কাছে ভালো। একজন পুরুষ ভালো জীবনসঙ্গী হিসেবে তার স্ত্রীর কাছে ভালো স্বামী হতে পারেন নানান উপায়ে। স্ত্রীর কাছে স্বামীরা যেসব গুণাবলীর কারণে ভালো হয় তার মাঝে উল্লেখযোগ্য কিছু গুণ হলো --

১) স্ত্রীর প্রতি তিনি সুন্দর ব্যবহার করেন। উত্তম শব্দ ব্যবহার করে কথা বলেন। তার প্রতি তিনি নম্র ও দয়ার্দ্র থাকেন।

২) জীবনসঙ্গিনীর অধিকারের বিষয়গুলো তিনি অবহেলা করেন না, তা পরিপূর্ণভাবে পূরণ করতে চেষ্টা করেন।

৩) বাইরে নানান কাজে থাকলেও অন্য কোন মহিলার ব্যাপারে তিনি আগ্রহী হন না। দৃষ্টিকে সংযত রাখেন, হৃদয়েকেও অত্যন্ত সচেতনভাবে সতর্ক রাখেন।

৪) নিজে ইসলাম শিখেন নিয়মিত, স্ত্রীকে নিয়ে শিখেন এবং তাকে উৎসাহিত করেন। দু'জনে মিলে ইসলামকে পালনের চেষ্টা করেন।

৫) জীবনসঙ্গিনী যখন খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে যায়, তিনি শক্ত অবলম্বন হয়ে তার পাশে থাকেন।

৬) যদি তার স্ত্রী কখনো তাকে কষ্ট বা আঘাত দিয়ে ফেলে, তিনি নিজেকে শান্ত রাখেন। খেপে যান না কেননা তিনি ধরেই নেন স্ত্রী হয়ত তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট দিতে চাননি, অসতর্কতায় এমনটি হয়ে গেছে।

৭) জীবনসঙ্গিনীর ছোট ছোট ভুলগুলো তিনি এড়িয়ে যান এবং তার ভালো কাজগুলোকে উৎসাহিত করেন। তার পরিশ্রমের কাজগুলোর ব্যাপারে প্রশংসা করেন।

৮) ঘরের কাজগুলোতে স্ত্রীকে সাধ্যমতন সাহায্য করেন। তার জন্য কাজ ফেলে রেখে দেন না।

৯) সন্তানদেরকে ইসলামিক জ্ঞানে এবং আচরণে বড় করার ব্যাপারে সচেতন থাকেন। সন্তানদের ইসলামিকভাবে বড় করা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে আলাপ করে স্ত্রীর সাথে। বাবা-মায়ের আচরণ

সন্তানদের প্রভাবিত করে, তাই বাবা-মায়েরা নিজেরাও সচেতন থাকেন নিজেদের ব্যক্তিগত চরিত্র, স্বভাব এবং আচরণ নিয়ে।

১০) কোন কারণে মনোমালিন্য হলেও ঘরের বাইরে কখনো দু'জনে আলাদা হন না, স্ত্রী বাইরে যাবার প্রয়োজন হলে সবসময় তাকে সঙ্গ দেন। মাঝে-মাঝেই দু'জনে মিলে ঘুরতে যান যেন স্ত্রী কিছুটা সময় তার সঙ্গ পেয়ে আনন্দিত হয় যা তাদের সম্পর্ককে প্রগাঢ় করবে।

স্ত্রীর যেসব গুণাবলীর কারণে স্বামীরা তাদের ভালোবাসেন

জীবনসঙ্গিনী একজন পুরুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উত্তম স্ত্রী যিনি জীবনে পান, তিনি একজন ভাগ্যবান পুরুষ। তেমনি একজন স্ত্রীর কাছে যিনি ভালো স্বামী তিনিই প্রকৃত উত্তম চরিত্রের মানুষ। একজন সফল ব্যক্তির পাশে থাকেন তার সুযোগ্য সহযোদ্ধা, সহযাত্রী, বন্ধু হিসেবে তার স্ত্রী। সৎ এবং চরিত্রবান স্ত্রী একজন পুরুষের জন্য এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। একজন অসাধারণ জীবনসঙ্গিনীর অনেক উত্তম গুণাবলী হতে পারে, তার মধ্যে কয়েকটি হলো -

১) স্বামী বাইরে থেকে ফিরলে সম্ভব হলে দরজাটা নিজেই খুলে দেন, একটি হাসি উপহার দিয়ে দু'জনের মাঝে শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ চেয়ে তাকে বলেন, "আসসালামু আলাইকুম।"

২) তার জীবনসঙ্গী কাজ শেষে বাসায় ফেরার পর তাকে ফ্রেশ হয়ে নিতে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো এগিয়ে দিন। একটু কষ্ট করে তার জন্য সময়মত খাবারটি পরিবেশন করেন। সুসংবাদটি তাড়াতাড়ি জানান এবং খারাপ সংবাদ থাকলে একটু সময় নিয়ে তারপর বলেন।

৩) স্বামীর নির্দেশনাগুলো শোনেন এবং সাধ্যমত চেষ্টা করেন যেন তাকে সন্তুষ্ট রাখা যায়। কোন বিষয় নিয়ে স্বামীকে কখনো চাপে রাখেন না বরং তার মনে শান্তি দেয়ার চেষ্টা করেন।

৪) যদি তার জীবনসঙ্গী মানুষটা কখনো তাকে কষ্ট বা আঘাত দিয়ে ফেলে, তিনি নিজেকে শান্ত রাখেন। খেপে যান না কেননা তিনি ধরেই নেন হয়ত তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট দিতে চাননি, অসতর্কতায় এমনটি হয়ে গেছে।

৫) জীবনসঙ্গীর ছোট ছোট ভুলগুলো তিনি এড়িয়ে যান এবং তার ভালো কাজগুলোকে উৎসাহিত করেন। তার পরিশ্রমের কাজগুলোর ব্যাপারে প্রশংসা করেন।

৬) নিজেকে পরিপাটি ও সুন্দর করে উপস্থাপন করেন স্বামীর সামনে যা তিনি অন্য কারো সামনে, কারো জন্য করেন না। সম্ভব হলে সুগন্ধি ব্যবহার করেন।

৭) সৌহার্দ্যপূর্ণ ভালোবাসার গলায় জীবনসঙ্গীর সাথে কথা বলেন। এই কোমল সুরে তিনি অন্য কোন পুরুষের সাথে কখনো কথা বলেন না। যাদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ নয় এমন পুরুষদের সাথে যথাসম্ভব কোমলতাহীন কণ্ঠে এবং সাধ্যমতন সংক্ষিপ্তভাবে কথা বলাই ইসলামের শিক্ষা।

৮) তার স্বামীর আয় থেকে অতিরিক্ত ব্যয় করেন না, অবর্তমানে তিনি তার সংসারের সবকিছু এমনভাবে দেখভাল করেন যেন স্বামীর অপছন্দের কিছু না ঘটে।

৯) জীবনসঙ্গী যখন খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে যায়, তিনি তার পাশে থাকেন, ধৈর্যধারণ আর সদুপদেশ দিয়ে তাকে ধীরস্থির হয়ে সময় কাটিয়ে ওঠার পথে সাহায্য করেন।

১০) স্বামী তার প্রতি সঠিক আচরণ না করলেও ধৈর্য ধরেন, চেষ্টা করেন তাকে উত্তম উপায়ে তার প্রত্যুত্তর দিতে।

১১) শালীনতা রেখে উত্তম পোশাক পরেন যাতে কেননা পোশাকে রুচিবোধ ফুটে ওঠে। ঈমানের সাথে লজ্জার সম্পর্ক খুবই গভীর। যিনি যত বেশি ঈমানের অধিকারী/অধিকারিণী তার লজ্জাবোধ তত বেশি। একজন উত্তম মুসলিমাহ এসব বিষয়ে সচেতন দৃষ্টি রাখেন।

১২) সন্তানদের ইসলামিক জ্ঞানে বড় করে তুলতে সামর্থ্যের সর্বোচ্চটুকু করেন। নিজেও আন্তরিকভাবে ইসলাম সম্পর্কে শেখেন এবং স্বামী-স্ত্রী দু'জনে মিলে জীবনে ইসলামকে মেনে চলেন। বাবা-মায়ের আচরণ সন্তানদের প্রভাবিত করে, তাই বাবা-মায়েরা নিজেরাও সচেতন থাকেন নিজেদের ব্যক্তিগত চরিত্র, স্বভাব এবং আচরণ নিয়ে।

আপনার জীবনসঙ্গী ঘরে ফিরলে তাকে সুন্দর করে গ্রহণ করুন

হে আমার বিবাহিতা বোন, আপনার জীবনসঙ্গী ঘরে ফিরলে তাকে সুন্দর করে গ্রহণ করুন, অভ্যর্থনা জানান।

অফিসে যাওয়া, স্কুলে যাওয়া, বাইরে ভ্রমণে যাওয়া বা অন্য যা-ই আপনাদের দু'জনকে আলাদা করেছিলো, সেটা শেষ হয়ে যাবার পরে তাকে আন্তরিক ও সুন্দর একটি অভ্যর্থনা দিন যা তার মন ভালো করে দিবে, আপনাদের বন্ধনকে আরো গাঢ় করবে...

- দরজাটা নিজে খুলুন, আপনার মিষ্টি হাসিটি তাকে উপহার দিন

- দু'জনের মাঝে শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ চেয়ে তাকে বলুন, "আসসালামু আলাইকুম।"

- সুগন্ধী বা পারফিউম ব্যবহার করে নিজেকে আকর্ষণীয় করে নিতে পারেন।

- আপনার জীবনসঙ্গীকে সুসংবাদটি তাড়াতাড়ি দিন এবং খারাপ সংবাদ থাকলে দেরি করে জানান।

- সৌহার্দপূর্ণ ভালোবাসার গলায় তার সাথে কথা বলুন।

- ফ্রেশ হয়ে নিতে তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো এগিয়ে দিন।

- একটু কষ্ট করে তার জন্য সময়মত খাবারটি পরিবেশন করুন।

- আপনাদের দু'জনের আবার দেখা করিয়ে দেয়ায় আল্লাহর কাছে শুকরিয়া করুন দু'জন মিলে, আলহামদুলিল্লাহ। যারা কৃতজ্ঞ হয় আল্লাহর প্রতি, আল্লাহ তাদের প্রতি তার দানকে আরো বাড়িয়ে দেন।

dampotto.blogspot.com

স্ত্রীর প্রতি দায়িত্বশীলতা

"আজ সারাদিন কাজের বেশ চাপ ছিল, এখন কথা বলতে পারব না।" -

দিনশেষে ঘরে ফিরে এটাই হয় আপনার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে আপনার প্রথম কথা। আপনি আসলে কি করছেন আপনি জানেন? আপনি আপনার দাম্পত্য জীবনকে নিজ হাতে ধ্বংস করছেন।

এখন আমি কিছু প্রশ্ন করবো আমার ভাইদের উদ্দেশ্যে। আমার প্রশ্নগুলো বোনদের পক্ষ থেকে নয় বরং একজন সাংসারিক পুরুষ হিসেবে অপর পুরুষদের উদ্দেশ্যে।

-- আপনি শেষ কবে আপনার স্ত্রীর জন্য উপহার হাতে ঘরে ঢুকেছিলেন তাকে চমকে দেবার জন্য?

-- শেষ কবে আপনি আপনার স্ত্রীর জন্য অন্তত কিছু একটা নিয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন, একদম নিজ থেকেই, তার কোন আবদার ছাড়াই?

-- শেষ কবে আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে ঘরের পাশের বাজারটিতে নিয়ে গিয়েছিলেন যেখানে আপনার স্ত্রী কেনাকাটার জিনিস বাছাই করতে করতে আপনার মতামত চাইছিল আর আপনি বলছিলেন, "এটা না, হুম ওটা নাও..."?

-- শেষ কবে আপনি আপনার স্ত্রীকে বিনা আবদারে বাহিরে কোথাও ঘুরতে নিয়ে গিয়েছিলেন?

-- শেষ কবে আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার পাশের দোকান থেকে কিছু একটা কিনে দিয়েছিলেন - অন্তত একটা আইসক্রিম?একটু মনে করুন.....।

আসলে সত্য কথাটা কী জানেন? আপনার স্ত্রী আপনার থেকে বেশি কিছু চান না, আপনার প্রতি আপনার স্ত্রীর আবদারগুলো খুবই সীমিত। আপনার কাছে আপনার স্ত্রী যা চান তা হলো - আপনার সময়, তার প্রতি আপনার আর একটু বেশি মনোযোগ। খুব কি বেশি এই চাওয়াটুকু?

উস্তাদ নুমান আলী খান

বিদায় বেলা

মেয়েদের বলা হয় 'পরের ধন'। **কারণ একদিন**-না-একদিন তাদের নিজের ঘর ছেড়ে পরের ঘরে চলে যেতে হয়। আমাদের এই প্রাচ্যদেশে যেদিন একটি মেয়ে বাবা-মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে স্বামীর ঘরে যায়, সেদিনটি হয় বড় বেদনাবিধুর। সবার চোখে থাকে অশ্রু শব্দটা আমার নয়, ওরাই একজন অন্যজনকে বলছিলো, আমার শুধু কানে এসেছে, আর কানটা গরম হয়ে উঠেছে, তাদের কণ্ঠস্বরের উল্লাসটার কারণে। আশ্চর্য, কারো ঝামেলায়, বিপদে নিস্পৃহতা দেখেছি, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিমানবন্দরে বিভিন্ন জাতির যাত্রীদের মধ্যে, কিন্তু উল্লসিত হওয়া! এটা এই প্রথম দেখলাম, বাঙ্গালী হিন্দু বাবুদের মধ্যে। ভাবি, কী মাটি দিয়ে 'ভগবান' ওদের সৃষ্টি করেছেন?! ওদের দেবীমূর্তি গড়তে তো আবার বিশেষ মাটি লাগে!

আরেকটা কথা। পশ্চিমবঙ্গ বলছি আসলে 'আগের টানে টানে'; ওরা কিন্তু এখন নাম পরিবর্তন করে পশ্চিমবঙ্গকে বলে স্রেফ বাংলা, যেমনটা ছিলো বিভাগপূর্ব ভারতে যুক্তভাবে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের নাম। বাবুরা অবশ্য আমাদের আশ্বস্ত করেছেন, এর পিছনে তাদের 'অন্তরের ডালের মধ্যে কোন কালা নেই'; না থাকলেই বাঁচি।। ছোটবেলা থেকে কোলেপিঠে করে মানুষ করা মেয়েটিকে বিদায় দিতে গিয়ে বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে মন। নানা দুশ্চিন্তা ভীড় করে বাবা-মা'র মনে। কাজ করে মেয়ের ভবিষ্যত সম্পর্কে এক ধরনের শঙ্কা ও অনিশ্চয়তাবোধ ।

সাধারণত মায়েরাই মেয়েদের সার্বিক দেখাশোনা করেন। এ কারণে মায়ের সাথেই মেয়েদের সম্পর্ক থাকে বেশি। তাই বিদায়ের আগে মেয়েদের যেসব বিষয় বুঝিয়ে দেওয়া দরকার তা মায়েরাই করে থাকেন। বিদায়ের আগে মেয়ের বাবারও মেয়েকে অনেক কিছু বলার থাকে। বিশেষ করে সে-বাবা যদি হন একজন সচেতন মানুষ। কিন্তু তখন মনে যে আবেগের ঢেউ থাকে তাতে শেষ পর্যন্ত আর কিছুই বলা হয়ে ওঠে না- জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে আসে, কথা বলার শক্তি ফুরিয়ে আসে। কলমের আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া অপারগ 'জনকের' জন্যে তখন আর কোনো পথ খোলা থাকে না। কলমের আশ্রয় নিয়ে এই লেখাটিতে একজন 'জনকের' সেই না-বলা কথাগুলোকে ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, বিদায় বেলা যা তিনি মেয়েকে মুখ ফুটে বলতে পারেননি। সব পিতার মনেই হয়তো এ অনুভূতিগুলো থাকে। নতুন জীবনে প্রবেশকারী মেয়েরা যদি এ কথাগুলো মনে রাখে তাহলে হয়তো তাদের সংসার-জীবন সুখী হবে।
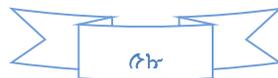
প্রিয় মা! এই তো সেদিনকার কথা, তুমি আমাদের ঘরে ফুল হয়ে ফুটেছিলে। আল্লাহ জানেন, তোমার জন্মের পর দয়াময় আল্লাহর দরবারে আমি কী শুকরিয়া আদায় করেছি! মেয়েরা জন্ম নেয় 'রহমত' হয়ে। শুধু নিজের নয়, বাবা-মা'র রিযিকও একটি মেয়ে নিয়ে আসে। তোমার জন্মের পর আমাদের রিযিকে যে-বরকত নেমে এসেছিল আমি তা অনুভব করতে পেরেছিলাম। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে তোমার ছোটবেলার কথা- তুমি হৈ চৈ করতে, বায়না-আবদার করতে, কখনো জেদ ধরতে- রেগে যেতে, আবার একটু পর উৎফুল্ল হয়ে উঠতে...।

আল্লাহ তাআলার বড় অনুগ্রহ, তুমি এমন পরিবেশে চোখ মেলেছো, যেখানে তুমি খুব ছোটকালেই কালিমা ও নামাজ শিখে ফেলতে পেরেছো। কুরআন মাজীদ হিফজ করেছো, যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। এরপর কুরআন বোঝা, হাদীস শেখা ও ফিক্হ অধ্যয়নেরও সুযোগ হয়েছে। এগুলো শেখার পথ আল্লাহ তোমার জন্যে সহজ করে দিয়েছিলেন। আর আজ তোমার বিয়ে দিয়ে তোমার প্রতি শেষ দায়িত্বটুকু পালন করে আমি নিশ্চিত হচ্ছি। এই 'মহৎ' দায়িত্বটি পালন করতে পেরে আমার খুশি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মনের আকাশজুড়ে ছেয়ে আছে কালো মেঘ। কলিজার টুকরা মেয়েকে বিদায় দেওয়া কি সহজ! বিয়ের দিন ঠিক হওয়ার পর থেকে হয়তো একটি দিনও এমন যায়নি, যেদিন আমার চোখ থেকে অশ্রু ঝরেনি। মন চাইছিল, নতুন জীবন সম্পর্কে তোমাকে কিছু কথা বলি। কিন্তু যখনই বলতে চেয়েছি, জিহŸা আড়ষ্ট হয়ে এসেছে। আজ এই লেখাটির মাধ্যমে আমার মনের কথাগুলো তোমাকে পৌঁছে দিচ্ছি। আশা করি তুমি এর প্রতিটি শব্দ মন দিয়ে পড়বে, প্রতিটি বাক্য হৃদয়ের মণিকোঠায় গেঁথে নেবে।

প্রিয় মা! আমরা দুর্বল-অযোগ্য, তবুও আল্লাহ আমাদের অসংখ্য নিআমত দান করেছেন। আপাদমস্তক আল্লাহর রহমত আমাদের ঢেকে রেখেছে। আল্লাহ তাআলার এ নিআমতরাজির মধ্যে সবচেয়ে বড় নিআমত হল 'ঈমান'। **কুরআনে কারীম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ**- এ দুই নিআমতও আমার দৃষ্টিতে ঈমানের নিআমতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ ঈমানের কারণেই আমরা এ দুই নিআমতের কদর করতে পারছি। নিআমত যত বড় হয়, তত গুরুত্ব দিয়ে তা হেফাজত করতে হয়। ঈমানের এই মহা নিআমতের কদর করবে, এর ব্যাপারে সচেতন থাকবে। এ-ক্ষেত্রে কোনো অবহেলা-ত্রুটির শিকার হবে না। ইবরাহীম আ. ও ইয়াকুব আ. নিজ সন্তানদের ওসিয়ত করেছিলেন, (তরজমা) 'আল্লাহ তোমাদের জন্যে দ্বীনে ইসলামকে মনোনীত করেছেন, সুতরাং পূর্ণ সমর্পিত না হয়ে যেন তোমাদের মৃত্যু না হয়।' সেই ওসিয়ত

আমিও তোমাদের করছি। ঈমানের এই মহা নিআমত এবং এ-নিআমত প্রাপ্তির সৌভাগ্যময় উপলব্ধি পরবর্তী প্রজন্মের কাছেও পৌঁছে দিবে।

মেরী লাখতে জিগার[1] সবর ও শোকরকে জীবনের 'প্রতীক' ( ) বানিয়ে রাখবে। জীবনে ভালো-মন্দ উভয় পরিস্থিতিরই সম্মুখীন হতে হবে। সবকিছু মানুষের মনমতো ঘটবে- এমনটি হওয়া অসম্ভব। পরিস্থিতি কখনো তোমার অনুকূল হবে, কখনো প্রতিকূল হবে। অনুকূল পরিস্থিতিতে আল্লাহর শোকর আদায় করবে। প্রতিকূল অবস্থায় সবর করবে। সবর ও শোকরকে যে নিজের জন্যে অনিবার্য করে নেয় সে কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় না। যে সবর ও শোকর অবলম্বন করে আল্লাহ তার সাথে থাকেন, তাকে সাহায্য করেন। আল্লাহ তাআলা ঈমানের অর্ধেক রেখেছেন সবরের মধ্যে, আর অর্ধেক রেখেছেন শোকরের মধ্যে। মনে রেখ, মানুষ বড় ত্বরাপ্রবণ। সেই সঙ্গে বড় বিস্মৃতিপ্রবণ। খুব দ্রুত তার স্মৃতি থেকে কথা হারিয়ে যায়। হাজারো অনুগ্রহ মুহূর্তে ভুলে যায়। সামান্য কষ্টে অস্থির হয়ে ওঠে। তুমি এমন হবে না।

প্রিয় মা! আমি আমার পড়াশোনা ও দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, যত উত্তম গুণাবলী আছে তার মাঝে সর্বোত্তম গুণ হল ই'তিদাল (মধ্যপন্থা ও পরিমিতিবোধ)। **মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্বের কারণও এই ই'**তিদাল। ই'তিদাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের এক উজ্জ্বলতম দিক। জীবনের সব ক্ষেত্রে ই'তিদাল থাকা বাঞ্ছনীয়। দ্বীনী বিষয় হোক বা দুনিয়াবী, দেহ ও শরীরের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় হোক বা হৃদয় ও আত্মার সাথে সম্পৃক্ত- জীবনের সর্বাঙ্গনে ই'তিদাল থাকা আবশ্যক। সে-দ্বীনদারি বাঞ্ছিত নয় যা বৈরাগ্যে গিয়ে ঠেকে। আবার এমনটি হওয়াও উচিত নয় যে, জীবনের একমাত্র ধ্যান-খেয়াল হবে দুনিয়া। সব সময় আরাম আয়েশের চিন্তা করা, দেহের পরিচর্যা আর সাজ গোজ নিয়ে ব্যস্ত থাকা ঠিক নয়। আবার অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন থাকা, অকারণে নিজেকে কষ্ট দেওয়াও উচিত না। স্ত্রী হিসেবে একটি মেয়ের সীমারেখার মধ্যে থেকে কিছুটা সাজাগোজও করা উচিত। যে-মেয়ে এগুলোর ব্যাপারে উদাসীন থাকে সে স্বামীর হক নষ্ট করে; বরং সে নিজের হকও নষ্ট করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন আগেই ঘরে ঘরে খবর পাঠাতেন যেন পুরুষেরা ঘরে আসার আগে মেয়েরা নিজেদের গুছিয়ে নিতে পারে।- সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০৭৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭১৫

মা! যবান আল্লাহ তাআলার এক মহা নিআমত। এই যবান আল্লাহ তাআলার এক সৃষ্টিকারিশমা। ছোট্ট এই গোশতের টুকরার মাঝে আল্লাহ তায়ালা বিপরীতমুখী সব শক্তি দিয়ে রেখেছেন। ছোট্ট

এই গোশতের টুকরাটি একটি অগ্নিকাণ্ডের জন্ম দিতে পারে। আবার সেই অগ্নি নির্বাপনও করতে পারে। কাঁটাগুল্মময় জঙ্গল যেমন তৈরি করতে পারে, তেমনি পারে ফুলে ফুলে শোভিত একটি বাগান জন্ম দিতে। এটি দুটি হৃদয়ে বিভেদরেখা টেনে দিতে পারে, আবার সেই রেখা মুছেও দিতে পারে। ঈমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্য টানার জন্যে খুব বেশি কিছু করার প্রয়োজন পড়ে না। একটি বাক্যই যথেষ্ট। কিন্তু এর যে-ফল দাঁড়ায় তার জন্যে কখনও সর্বস্ব দিয়ে দিতে হয়। যবানের অনিষ্ট থেকে সে-ই বাঁচতে পারে যে মুখে শরীয়তের লাগাম টেনে দেয়, যেখানে মুখ খোলাটা দুনিয়া-আখেরাতের জন্যে কল্যাণকর সেখানেই শুধু মুখ খোলে। যেখানে কথা বলার কোনো ফায়দা নেই বা কথা বললে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা আছে সেখানে সে চুপ থাকে। ঘরে ঘরে ঝগড়াঝাটি, কলহ-বিবাদ আর সংসার ভেঙ্গে যাওয়ার যে কথা শোনা যায় খোঁজ নিলে দেখা যাবে এর সত্তর ভাগ কারণ যবানের অসংযত ব্যবহার। এ জন্যেই যবানে নুবুয়তে ঘোষিত হয়েছে, যে চুপ থাকল সে মুক্তি পেল।- সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০৭৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস৭১৫

অন্য একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আমি তার জন্যে জান্নাতের একপাশে একটি ঘরের জামিন হচ্ছি, যে বিবাদ করা থেকে বিরত থাকে, যদিও হক তার পক্ষে হয়। আমি তার জন্যে জান্নাতের মধ্যস্থলে একটি ঘরের জামিন হচ্ছি, যে মিথ্যা বর্জন করে; ঠাট্টাচ্ছলেও মিথ্যা বলে না। এবং তার জন্যে জান্নাতের উচ্চস্তরে একটি ঘরের জামিন হচ্ছি, যে নিজের আচার-আচরণকে সুন্দর করে। - সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৮০০

আমার ক্ষুদ্রচিন্তায়, যদি এই একটি হাদীসের উপর সবাই আমল করতে পারে তাহলে আমাদের সব কলহ-বিবাদ শেষ হয়ে যাবে।

পেয়ারী বেটি! এ যুগের একটি দুঃখজনক বাস্তবতা হল, সবাই প্রাপ্য সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতন কিন্তু কর্তব্য সম্পর্কে সীমাহীন গাফেল। শত অভিযোগ, শত বিবাদ-বিতর্কের পেছনের কারণ এই বিরুদ্ধ চিন্তা। বাবা-মা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, স্বামী-স্ত্রী, ছোট-বড়, মালিক-শ্রমিক, শাসক-শাসিত সবাই এই বিরুদ্ধ চিন্তার কারণে একে অপরের প্রতি অসন্তুষ্ট।

এর বিপরীতে যদি আমরা কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হই, নিজের করণীয়’র প্রতি গুরুত্ব দিই আর প্রাপ্যের ব্যাপারে ছাড় দিই; এ ক্ষেত্রে অপরকে প্রাধান্য দেওয়ার মনোভাব পোষণ করি, তাহলে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি তো অর্জন করতে পারবই, বিপরীতপক্ষও একসময় প্রভাবিত হবে। সে

যত পাষাণদিলই হোক একদিন-না-একদিন তার মন তাকে ধিক্কার দিয়ে বলবেই- ওকে ওর প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। নেহাত ভালো মানুষ বলে ও মুখ বুজে সব সহ্য করে গেছে।

আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি প্রাপ্যের চেয়ে কর্তব্যের ব্যাপারে বেশি সচেতন হবে।

জানে জিগার! এ যুগে ওয়াসওয়াসা ও অমূলক ধারণা এক সংক্রামক ব্যাধির রূপ লাভ করেছে। এ রোগকে হাজারো রোগ-ব্যাধির মূল বললে ভুল হবে না। প্রচুর সংখ্যক লোক এ রোগে আক্রান্ত। এ রোগ যে কত ভয়াবহ তা তুমি এ থেকে আন্দাজ করতে পার যে, কুরআনে কারীমের শেষ সূরায় আল্লাহ তাআলা ওয়াসওয়াসা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে পানাহ চাইতে নির্দেশ দিয়েছেন। (তরজমা) বলুন, আমি মানুষের প্রতিপালকের কাছে, মানুষের অধিপতির কাছে, মানুষের মাবুদের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি- আত্মগোপনকারী ওয়াসওয়াসা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে। যে মানুষের মনে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে। সে জ্বিন হোক বা মানুষ।-সূরা নাস : ...

সেখানে আল্লাহ তাআলা এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন, ওয়াসওয়াসা সৃষ্টিকারী জ্বিনও হতে পারে, মানুষও হতে পারে। এ ধরনের লোকদের থেকে তুমি সতর্ক থাকবে। এ ধরনের নারী-পুরুষ, বান্ধবী, সমবয়সী মেয়ে-পড়শি থেকে দূরে থাকবে। অমূলক ধারণা, ওয়াসওয়াসা ও কুমন্ত্রণার কারণে অনেক সংসার ভেঙ্গে যেতে দেখেছি আমি। জটিল রোগ-ব্যাধি, ব্যবসা-বাণিজ্যের সমস্যা, ঘরোয়া কলহ-বিবাদ বা কারো সন্তান হতে দেরি হচ্ছে- এ সমস্ত ক্ষেত্রে দুষ্ট লোকেরা কানে এই কুমন্ত্রণা দেয় যে, এর পেছনে ননদ, ভাবী, শ্বাশুড়ি বা পাড়া-পড়শির হাত আছে; তারা হয়তো তাবিজ-কবজ করেছে। এ ধরনের কথা কানে তুলবে না। আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে। আল্লাহ না চাইলে যত বড় যাদুকর বা আমেলই হোক, কেউ কারো কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

আল্লাহ না করুন, জীবনে চলতে গিয়ে যদি কোনো সমস্যায় পড়, যদি কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হও তাহলে চির অমুখাপেক্ষী আল্লাহর দরবারে হাত তুলে বলবে, 'হে 'ফকিরের' রব! আমার পেরেশানি দূর করে দাও।' আমি কসম করে বলছি, আমি ও আমার মত সব মানুষ 'ফকির', ধনী ও অমুখাপেক্ষী একমাত্র তিনি। সমস্যা থেকে উদ্ধার পাওয়ার সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার এই দুআ। এই হাতিয়ারে যেন কখনো মরচে না পড়ে।

এ বিষয়টিও বলে দেওয়া জরুরি মনে হচ্ছে- নিজের ইলম-কালাম, আমল-আখলাক নিয়ে কখনো গর্ব করবে না। আমাদের আল্লাহ 'তাওয়াযু' (বিনয়) পছন্দ করেন। ছাহিবে ইলমের উচিত অন্যদের

চেয়ে বিনয়ী হওয়া। কারণ ফলদার গাছ ঝুঁকে থাকে। যে বিনয়ী আচরণ করে সে মানুষের সম্মান-শ্রদ্ধা পায়। আর যে অহংকার করে সে দুনিয়া-আখেরাতে সব জায়গায় লাঞ্ছিত হয়। ঐ হাফেজা ও আলেমা মেয়েরা ইলমের রূহ থেকে বঞ্চিত থাকে, ইলমের সমুদ্র থেকে কয়েক ফোঁটা ইলম নিয়ে হজম করতে না পেরে যারা সবাইকে তুচ্ছ নজরে দেখতে থাকে।

বেটি! আমি জানি এখন বিয়েশাদিতে কী ধূমধাম হয়। কত রসম-রেওয়াজ আর প্রথা পালন করা হয়। যৌতুকের প্রদর্শনী হয়। গায়ে হলুদ, বৌভাত, সেলামি- আরও কত কী। এগুলোর পেছনে লক্ষ রুপি খরচ করা হয়। তুমি অন্যান্য বিয়েশাদি দেখে হীনম্মন্যতার শিকার হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী ও মেয়েদের সাদাসিধে বিয়ের কথা মনে রাখবে। আমি কীভাবে আল্লাহর শোকর আদায় করব জানি না- বিভিন্নজন পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও বিয়ের আয়োজন আমি যথাসম্ভব সাদাসিধা রাখার চেষ্টা করেছি।

আমি তোমাকে খুব বেশি কিছু দিয়ে দিতে পারিনি। কিন্তু বিদায় দেওয়ার সময় আমি তোমাকে দু'টো জিনিস দিয়েছি। কুরআন ও তাফসীর। পূর্ববর্তী মনীষীদের জীবনীতে আছে, তাঁদের কেউ যদি তাঁর মেয়েকে কুরআন বোঝার মত যোগ্য করে তুলতে পারতেন আর বিদায় বেলা তাকে কুরআন মজীদের একটি কপি (সেকালে হাতে লিখে কপি তৈরি করতে হত। এখনকার মত প্রেস তখন ছিল না।-অনুবাদক) দিয়ে দিতে পারতেন তাহলে বলা হত, তিনি তাঁর মেয়েকে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান উপঢৌকন দিয়েছেন। এক দুর্বল ও ভগ্নহৃদয় পিতার পক্ষ থেকে দেওয়া এই অতুলনীয় হাদিয়া তোমার জন্য মোবারক হোক...।

মাওলানা আসলাম শেখুপুরী (মাসিক আল-কাওসার)

চারপাশে সংসার ভাঙ্গনের জোয়ার !

খুব কষ্ট ও ভয় হয় আজ চারপাশে সংসার ভাঙ্গনের জোয়ার দেখে..

ইসলামকে মেনে চলেন না এমন এক পরিচিত ভাই প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন প্রায় দশ বছর আগে। সে আমলের চারপাশ কাঁপানো প্রেমিক-প্রেমিকা জুটি। আন্ডারগ্র্যাড শেষ করার আগেই তারা বিয়ে করেন, সংসারের প্যাঁচে পড়েই হয়ত, দু'জনার কেউ সেই ডিগ্রির বৈতরনী পার হতে পারেননি। স্বামী ও স্ত্রী যথাক্রমে ব্যবসায় এবং চাকুরিতে নেমে পড়েছিলেন সেই যোগ্যতা থেকেই। পরবর্তীতে দশ বছর বয়সী সন্তানটিকে বাপের কাছে রেখে মা এখন আলাদা থাকেন। মা এখন চাকুরিজীবী। ঐ ডিগ্রি নিয়ে কী চাকুরি করেন তা ঠিক জানা সম্ভব হয়নি। বাপ ছেলেকে নিয়ে নিকটাত্মীয়দেরকে যথেষ্টই যন্ত্রণায় রেখেছেন। একটি পুরুষ ও নারীর যন্ত্রণায় এখন সমগ্র দু'টি পরিবার।

বিয়ে ও সম্পর্কের বিষয়গুলো কখনই সিনেমার মতন নয়। প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আপনারা কল্পনাতেও বাস্তবতাকে মুভির মতন করে যেন না ভাবেন। জীবনের বাস্তবতায় গোলাপ ফুলের সুঘ্রাণ নিয়ে সাহিত্যিক ও রোমান্টিক আলাপের সুযোগ না হলেও আদা ও রসুন-বাটার ঘ্রাণে ডুবে থাকতেই হয় একজন নারীকে। স্ত্রীকে সাথে নিয়ে পাহাড়ে-নদীতে ঘুরতে না পারলেও বাজারের ব্যাগের সাথে, চাল-ডাল-তেলের সাথে ঘুরতে হয় পুরুষকে।

এই দায়িত্বশীলতায়, এই দায়বদ্ধতার মাঝে এবং ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকেই আল্লাহ অসাধারণ শান্তি দিয়ে দেন তাদেরকে, যারা আল্লাহর জন্য এই সম্পর্কটিতে নিজেদেরকে জড়িয়ে নেয়। দুনিয়ার জীবন জান্নাত নয়, "অতঃপর তারা সুখে শান্তিতে বসবার করিতে লাগিলো" -- এমন কোন আলাপ আপনি কারো ব্যাপারে করতে পারবেন না কখনই। ক্রমাগত মুজাহাদা ও পরিশ্রম করাই দুনিয়ার জীবনের রূপ।

বিয়ের আগে মনে রাখবেন ভিন্ন ব্যক্তিত্বের, ভিন্ন পছন্দের, ভিন্ন পরিবারের ভিন্ন রুচির একজনকে আপনি জীবনের সঙ্গী করে সম্ভাব্য অনেক যুদ্ধে তাকে সহযোদ্ধা করতে যাচ্ছেন। যারা সংসার জীবনে বেশি করে মানিয়ে নিতে পারে, তারাই বেশি সুখী হয়। কিন্তু অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টি হতে হবে স্বামী-স্ত্রীর বিয়ের মূল উদ্দেশ্য।

নিজেকে এমনভাবে প্রস্তুত করুন যেন আপনি সহজে মানিয়ে নিতে পারেন। চেষ্টা করুন নিজের ইগোকে কমিয়ে আনতে। আজকাল পরিবারগুলোর ভাঙ্গনের পেছনে ইগো অন্যতম প্রধান কারণ। বলছিলাম বিয়ের প্রস্তুতি হিসেবে নিজের ইগোকে অবশ্যই কমিয়ে আনুন। ইগো কাকে বলে জানেন তো?কেউ যখন আপনাকে সংশোধন করে দেয় এবং আপনি তার উপরে ক্ষিপ্ত/বিরক্ত হয়ে যান; তখনই বুঝবেন আপনার ইগো আছে। এই সমস্যাকে কাটিয়ে উঠুন খুব শীঘ্রই। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে জয়-পরাজয়ের হিসেব সবাইকে কুরেকুরে খাচ্ছে। সম্মান করলে সম্মানিত হবেন, তাই মানুষকে সম্মান করতে শিখুন।

আল্লাহ আমাদের পরিবারগুলোকে শান্তির আবাসভূমি বানিয়ে দিন।

আগন্তুক মুসাফির

জীবন হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ জিনিস এবং ত্রুটিপূর্ণ মানুষের সমষ্টি

[ড. এ পি জে আব্দুল কালামের জীবন থেকে নেয়া]

"যখন আমি ছোট ছিলাম, আমার মা আমাদের জন্য রান্না করতেন। তিনি সারাদিন প্রচুর পরিশ্রম করার পর রাতের খাবার তৈরি করতেন। এক রাতে তিনি বাবাকে এক প্লেট সবজি আর একেবারে পুড়ে যাওয়া রুটি খেতে দিলেন। আমি অপেক্ষা করছিলাম বাবার প্রতিক্রিয়া কেমন হয় সেটা দেখার জন্য। কিন্তু বাবা চুপচাপ রুটিটা খেয়ে নিলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন স্কুলে আমার আজকের দিনটা কেমন গেছে।

আমার মনে নেই বাবাকে সেদিন আমি কি উত্তর দিয়েছিলাম কিন্তু এটা মনে আছে যে, মা পোড়া রুটি খেতে দেয়ার জন্য বাবার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন। এর উত্তরে বাবা মা'কে যা বলেছিলেন সেটা আমি কোনদিন ভুলব না। বাবা বললেন, 'প্রিয়তমা, পোড়া রুটিই আমার পছন্দ'। পরবর্তীতে সেদিন রাতে আমি যখন বাবাকে শুভরাত্রি বলে চুমু খেতে গিয়েছিলাম তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে তিনি কি আসলেই পোড়া রুটিটা পছন্দ করেছিলেন কিনা। বাবা আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বললেন, "তোমার মা আজ সারাদিন অনেক পরিশ্রম করেছেন এবং তিনি অনেক ক্লান্ত ছিলেন। তাছাড়া একটা পোড়া রুটি খেয়ে মানুষ কষ্ট পায় না বরং মানুষ কষ্ট পায় কর্কশ ও নিষ্ঠুর কথায়। জেনে রেখো, জীবন হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ জিনিস এবং ত্রুটিপূর্ণ মানুষের সমষ্টি।"

আমি কোনক্ষেত্রেই সেরা না বরং খুব কম ক্ষেত্রেই ভাল বলা যায়। এ জীবনে আমি যা শিখেছি সেটা হচ্ছে, আমাদের একে অপরের ভুলগুলোকে মেনে নিতে হবে এবং সম্পর্কগুলোকে উপভোগ করতে হবে। জীবন খুবই ছোট; প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে অনুতপ্ত বোধ করার কোন মানেই হয় না। যে মানুষগুলো তোমাকে যথার্থ মূল্যায়ন করে তাদের ভালোবাসো আর যারা তোমাকে মূল্যায়ন করে না তাদের প্রতিও সহানুভূতিশীল হও।"

ব্যর্থ বিয়েঃ একটি বিশ্লেষণ

একবার এক তরুণ আমাকে অসন্তোষের সুরে বলেছিল, "আমার বিয়েটা ব্যর্থ হয়েছে"। আমি সান্তনা দিয়ে উত্তরে বলেছিলাম, "যদি তোমার তালাক হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্‌'তালা তোমাকে আরেকজন স্ত্রী দেবেন, ইনশা'আল্লাহ্‌"। সে উত্তরে বলেছিল, "না , না, আমাদের তালাক হয় নি। কিন্তু আমাদের বিয়েটা ব্যর্থ হয়েছে, তবে আমরা এখনো একই সাথে থাকি"।

আমাদের সমাজের ব্যর্থ বিয়েগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য ক্যাটাগরি হচ্ছে এই ধরনের বিয়েগুলো। "আমরা সুখী নই, কিন্তু আমরা একই সাথে বসবাস করি"---আমাদের আশেপাশের অধিকাংশ 'ব্যর্থ বিয়ে' এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন কারণে অনেক দম্পতি হতাশার সাথে তাদের দুর্বিষহ বিবাহিত জীবনকে টেনে বেড়ায়। তাদের ভেতরে কেউ কেউ সমাজ- লোক লজ্জা-পারিবারিক মর্যাদার কথা ভাবেন। কেউ আবার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা [নিজের ও সন্তানের] চিন্তা করেন, একবার বিয়ে ভেঙে গেলে আবার কে বিয়ে করবে (বিশেষ করে মেয়েরা), বাবা-ভাই যদি না দেখে তাহলে কোথায় যাবে --- এইসব ভেবে শোচনীয় দাম্পত্য জীবন কাটায়।

"আমি জানি আমার মেয়ে খুব কষ্টের ভেতর আছে। তার স্বামী তার ভরণপোষণ করতে চায় না, তাই পেট চালানোর জন্য তাকে কাজ করতে হয়। শাশুড়িসহ শ্বশুরবাড়ির অনেকেই তার সাথে অকথ্য দুর্ব্যবহার করে, বাড়ির সমস্ত কাজ তাকেই করতে হয়। কিন্তু যেখানে ২৫-৩০ বছরের অবিবাহিত-সুন্দরী-উপার্জনশীল মেয়েদের সহজেই পাওয়া যায়। সেখানে আমার মেয়ের এখন ৩৭ বছর; শুধু তাই নয়, তার নিজেরও দুটো মেয়ে আছে। আমি যদি এখন আমার মেয়েকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসি, তাহলে আবার কার কাছে আমার মেয়েকে বিয়ে দিব? কে তাকে দুই মেয়ে নিয়ে বিয়ে করবে? আর তার মেয়েদেরই বা কি ভবিষ্যৎ হবে?" --- এই ছিল আমাকে বলা এক ভুক্তভোগী বাবার যন্ত্রণাকাতর স্বীকারোক্তি।

একজন সৎ পরামর্শদাতা এই ধরনের পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে সক্ষম। এক বা একাধিক অভিজ্ঞ অথবা প্রফেশনাল উপদেষ্টার আন্তরিক হস্তক্ষেপে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা হতে পারে। সুরা নিসার পঁয়ত্রিশ নং আয়াতে পারিবারিক কলহ মীমাংসার এক সুন্দর পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে, "যদি তাদের মধ্যে

সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতিরই আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। যদি তারা উভয়েই মীমাংসা চায় তবে আল্লাহ্ তাদের মিলন সাধনের (অনুকূল) পরিবেশ সৃষ্টি করবেন"। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি দেখা দিলে, বিরোধ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর্যায়ে পৌঁছাবার আগেই ঘরে তার সংশোধন ও মীমাংসার চেষ্টা করা উচিত। বেশী লোক জানাজানি বা প্রচার উভয় পক্ষের জন্যই ক্ষতিকর। এজন্য এই পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বামী ও স্ত্রীর উভয়ের পরিবার থেকে একজন করে লোক নিয়ে দু'জনের একটি সালিশ কমিটি বানাতে হবে। তারা উভয়ে মিলে বিরোধের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাবেন। তারপর এক সাথে বসে এর সমাধান ও মীমাংসার পথ বের করবেন। স্বামী-স্ত্রী চাইলে নিজেদের আত্মীয়দের মধ্য থেকে নিজেরাই একজন করে লোক বাছাই করে আনতে পারে। আবার উভয়ের পরিবারের বয়স্ক লোকেরা এগিয়ে এসে এ ধরনের সালিশ নিযুক্ত করতে পারে। স্ব-স্ব পরিবার থেকে নির্বাচনের ফলে সালিসকারী ব্যক্তিগণ ছেলে-মেয়ের (স্বামী-স্ত্রীর) দোষ-ত্রুটি, মেজাজ-মর্জি সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকেবহাল। সুতরাং তাদের জন্য ন্যায় বিচার ও বিরোধ নিস্পত্তি করা সহজতর হবে।

আয়াতের শেষ অংশটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করুনঃ

"যদি তারা উভয়েই মীমাংসা চায় তবে আল্লাহ্ তাদের মিলন সাধনের [অনুকূল] পরিবেশ সৃষ্টি করবেন"।

এই প্রেক্ষিতে আমি একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উল্লেখ করতে চাই। এই ধরনের একটি সালিশ নিষ্পত্তির জন্য আমাকে একবার নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তাদের অবস্থানে অনড়, পরস্পরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব। বিয়ের পর থেকেই ছোটখাট বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য চলতে চলতে সেটা বর্তমানে চরম অবস্থায় পৌঁছেছে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই অনমনীয় এবং 'যত দ্রুত সম্ভব ছাড়াছাড়ি হয়ে যাক' সেটাই চাইছে। আমরা যারা সালিশের কাজে নিয়োজিত ছিলাম তারাও প্রায় হাল ছেড়ে দিয়ে হতাশাগ্রস্থ। এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে আমার দাদী সাইয়েদা আব্দুল কারিম নাদিয়াদওয়ালা ঝড়ের বেগে মঞ্চে পদার্পণ করলেন। তিনি বললেন, "তোমরা কোনরকম সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আমাকে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের সাথে একান্তে কথা বলতে দাও"। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে আমার দাদীকে অনুসরণ করে অন্য ঘরে চলে গেল। আমরা অপেক্ষা করছিলাম। কয়েক মিনিট পর তারা তিনজন হাসি হাসি মুখে ফিরে এলো; আমার দাদী আনন্দিত ও রাশভারি মেজাজে ঘোষণা করলেন, "তাদের ভেতর মিটমাট হয়ে গেছে"! এই দম্পতি এখন পর্যন্ত সুখেশান্তিতে ঘর-

সংসার করছে। এই ঘটনার পর থেকে বহুবার বিভিন্ন সময়ে আমি আমার দাদীর কাছে জানতে চেয়েছি, "আপনি এমন কি বলেছিলেন, যার ফলে সেই দম্পতির ভেতর এতো দ্রুত মিটমাট হয়ে গেল এবং তারা তালাকের কথা আর মুখেও নিল না?" কিন্তু প্রতিবারই তিনি স্মিত হেসে নীরব থাকতেন। তার দশ বছর পর তিনি যখন শয্যাশায়ী, আমি দাদিকে আবার সেই প্রশ্ন করলাম। এইবার তিনি স্মিত হেসে আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "আমি দু'জনকে কষে দুটো চড় দিয়েছিলাম"!

অধিকাংশ পরিবারে এমন কিছু মুরুব্বী থাকেন যারা ভাঙ্গনের মুখে পতিত পরিবারকে একদম শেষ মুহূর্তে আল্লাহ্‌র সাহায্যে রক্ষা করতে সক্ষম হন। তবে একটা ব্যপার পাঠকদের পরিস্কারভাবে বুঝতে হবে, সালিশকারীর প্রতি প্রশ্নাতীত ভালোবাসা ও মমতা না থাকলে, শুধুমাত্র চপেটাঘাত করে এই সমস্যার সমাধান করা যায় না। সালিশকারীর অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞার সামনে উভয়েই (স্বামী-স্ত্রী) তাদের অনড় ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ অহং থেকে বেরিয়ে এসে নমনীয় ও আপোষের মনোভাব নিয়ে পরিস্থিতি বিবেচনা করতে সক্ষম হয়েছিল; ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্‘তালা তাঁর অসীম করুণায় তাদের জন্য মিলনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেন।

[Translated from the book "I want to marry" by Nisaar Yusuf Nadiadwala]

সিফাত মেহজাবিন

শূন্যতা

লীনার কেমন যেন শূন্য শূন্য লাগছে। না আদনান এবারও ওদের ম্যারেজ অ্যানিভার্সারী ভুলে যায়নি- সব বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বিরাট পার্টি দিয়েছে; নতুন শাড়ি, নতুন গহনা, ফুলের মালা; উপহারও বিয়ের চেয়ে কিছু কম পড়েনি; মিউজিক, লাইটিং কিছুরই ঘাটতি ছিলোনা। কিন্তু ঘরে ফিরে আসতেই দু'জনের মাঝে আবার সেই অস্পষ্ট, অস্পৃশ্য দুরত্ব। আদনান শুয়ে পড়েছে পার্টি থেকে এসেই, লীনা এখনও পোশাক পরিবর্তন করেনি। মনের ভেতর এক অস্বস্তিকর, দম বন্ধ করা গুমোট আবহাওয়া। নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ায় লীনা, সমুদ্র থেকে এক ঝলক বাতাস এসে ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে যায়, ঠিক যেমন দাদী দিতেন ছোটবেলায়। সময়ের হিসেব হারিয়ে যায়। কি করছে না ভেবেই ফোনের বোতামগুলো টিপতে থাকে লীনা। ফোনের ওপাশে ঘুম ঘুম কণ্ঠে 'হ্যালো' শুনে খুব লজ্জা পেয়ে যায়- একবার ভাবে ফোনটা কেটে দিলে কেমন হয়, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'দাদী, আমি লীনা, ঘুম থেকে তুললাম?

সাথে সাথে আনন্দে ভরে গেল দাদীর গলাটা, 'হ্যাঁরে নাতিন, এই বয়সে কি আর ঘুম আসে সোনা? আমি জেগেই ছিলাম। বল কেমন আছিস? এই বুড়িকে কি করে মনে করলি এত রাতে?'

ভাল মানুষকে ভাল কথা জিজ্ঞেস করেছে, দাদী কি আর মরে গেলেও নিজের কষ্টের কথা স্বীকার করবে? হঠাৎ নিজেকে কেমন যেন অসহায় মনে হয় লীনার। এই সহজ সরল গ্রাম্য মহিলা তাঁর সদাহাস্য চেহারার আড়ালে যেন ত্যাগ আর শক্তির এক বিমূর্ত চিত্র। আর লীনা সারাজীবন শহরে বড় হয়ে, পৃথিবীর নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাঁতভাঙ্গা বিষয়ে পি এইচ ডি করে, বিদেশের নামকরা কোম্পানিতে কাজ করে, রাতের মধ্যখানে ছত্রিশতলা বিল্ডিঙয়ের ষোলতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে, এই বয়সেই একটা অগোছালো জীবনের মালিক হয়ে।

'দাদী, তোমার বিয়ের গল্প শুনতে ইচ্ছে হোল, তাই ফোন করলাম।'

বুড়ি বুঝল সবই, কিন্তু বললনা কিছুই, বরং গল্প শুরু করল, 'অত কি আর মনে আছে রে নাতিন, পঁয়ষট্টি বছর আগের কাহিনী। আমার বয়স তখন বারো। বর্ষার দিন। মাঠে খেলছিলাম সখীদের সাথে। বড় ভাই এসে ডাকল, বলল বাবা ঘরে যেতে ডাকে। ঘরে গেলাম তো মা চাচী সবাই মিলে জোর করে পুকুরে চুবিয়ে, নতুন শাড়ি পরিয়ে, জটওয়ালা চুলগুলো টেনে ছিঁড়ে বেণী করে, রাঙ্গা

কাঁচের চুড়ি পরিয়ে হাজির করল এক বুড়োর সামনে। বুড়ো বলল, মেয়ে পছন্দ হয়েছে, বাড়ী অনেক দূর, এই বৃষ্টিবাদলের দিনে আবার আসা ঝামেলা, আজই বিয়ে হবে। আমার সে কি কান্না, বিয়ে হবে সেজন্য না, সখীদের কতজনের আমার আগেই বিয়ে হয়ে গেল! কান্না বুড়োর সাথে বিয়ে দিচ্ছে বলে। ওমা! রাতের বেলা দেখি বুড়ো না, বিয়ে হোল বুড়োর ছেলের সাথে। বিকালে অন্ধকারে বসে ছিলো, আমি দেখতেই পাইনি! সেই ত বুড়োই হয়ে গেল তোর দাদা। এখন বুড়োর সাথেই সংসার করছি!'

হেসে ফেলে লীনা, বলে, 'দাদী, আমার দাদার মত ঘাড়তেড়া একটা লোকের সাথে পঁয়ষট্টি বছর কেমনে সংসার করলে? আমাদের যুগে তো বিয়ে পাঁচ বছর টিকলেই আমরা মনে করি বিরাট ব্যাপার!'

দাদী বলে, 'জানিনা তো নাতিন। বিয়ে দিল, নিয়ে গেল, সংসার বুঝে নিতে নিতে বাচ্চাকাচ্চা হয়ে গেল, ওদের বিয়ে দিয়ে শেষ করতে করতে নাতিপুতি চলে এলো, তোর দাদার ঘাড়তেড়ামী নিয়ে ভাবার সময়ই পেলাম কই?'

'দাদী, তোমার কখনো মনে হতনা তুমি তোমার জীবনে কিছু মিস করেছ, কোন কিছু থেকে বঞ্চিত হয়েছ, কোন চাওয়া পাওয়া অপূর্ণ রয়ে গিয়েছে?'

দাদী হাসে, 'শোন রে নাতিন, সেই ছোটবেলায় বাবা মা শিখিয়েছিল, যারা ভাল কাজ করে তারা বেহেস্তে যায় আর যারা খারাপ কাজ করে তারা দোজখে। তখন থেকে জানি দুনিয়াতে সব পাওয়ার আশা করতে নেই, সব দুনিয়াতে পেয়ে গেলে আল্লাহকে গিয়ে চাইব কি? তোর দাদার কাছে কোনদিন কিছু পাওয়ার আশা করিনি, তোর দাদাও আশা করেনি, তাই যখন যাই পেয়েছি- একটু হাসি, দু'টো কথা, একটা বকুল ফুলের মালা, বাচ্চাদের থেকে লুকিয়ে পাঁচখানা বাতাসা- সবই মনে দোলা দিয়ে গেছে সুখ আর ভালবাসার। তোরা দেখেছিস তোর দাদার রাগ, আমি দেখেছি আমার জ্বর হলে অসহায়ের মত আমার শিয়রে বসে থাকা; তোরা দেখেছিস দাদা কত কড়া, আমি দেখেছি ছেলেমেয়ের অসুখ হলে লোকটা কেমন জায়নামাজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত; তোরা দেখেছিস দাদার গাম্ভীর্য, আমি দেখেছি তোদের জন্য কিছু পছন্দ হলে তাঁর চোখ দু'টা কেমন কারেন্টের বাত্তির মত জ্বলে উঠত। জীবনে সব কিছু পাওয়া যায়না বোন, কিন্তু সেটাই পাওয়া ভাল যা মন ভরে দেয় সুখে আর জীবন ভরে দেয় আনন্দে যদিও সবাই তা দেখতে না

পায়, বুঝতে না পারে। একজন ভাল মানুষের সাথে জীবন কাটাতে পারাটাই তো কত বড় একটা ব্যাপার! আর আখিরাতে তাঁকেই সাথী হিসাবে পাব এটা ভাবতেই তো কত ভাল লাগে!'

লীনা নিরুত্তর হয়ে যায়, 'দাদী, তোমাদের কখনো ঝগড়া হতনা?'

'না রে নাতিন, আমরা গ্রামের মেয়ে, বিয়ের সময় মা বলে দিয়েছে সে রাগ করলে তুই চুপ থাকবি, তাহলে আর ঝগড়া লাগবেনা, পরে মাথা ঠান্ডা হলে বুঝিয়ে বলবি। সেটাই করেছি সারাজীবন, সবার সাথে। রাগের সময় কথা বললে অনেক উল্টাপাল্টা, খারাপ ধরনের কথা বলা হয়ে যায় নাতিন যেটা পরে খারাপ লাগে, কিন্তু ফিরিয়ে নেয়ার উপায় থাকেনা। কিন্তু একটু ধৈর্য্য ধরতে পারলে পরে যে রাগ করল সে মাথা ঠান্ডা হলে নিজেই লজ্জা পায়, তখন তাকে বুঝালে সে নিজেই বুঝে। ঐটুকু ধৈর্য্য যদি সংসারের শান্তি আর নিজেদের সুসম্পর্ক জিইয়ে রাখতে পারে, তাহলে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে হলেও ধৈর্য্য ধরাই বুদ্ধিমানের কাজ, কি বলিস নাতিন?'

লীনা মাথা নাড়ে। তারপর খেয়াল হয় দাদী নিশ্চয়ই ফোনের ভেতর দিয়ে ওর মাথা নাড়া দেখতে পাবেন না। তার আগেই দাদী বলেন, 'ও নাতিন, তোর দাদা মনে হয় ওজু করতে যায়। কারেন্ট নাই, অন্ধকারে কিসে বাড়ি খাবে লোকটা, আমি টর্চটা নিয়ে যাই। তোর সাথে আবার পরে কথা বলব রে নাতিন। রাগ করিস না।'

'না না দাদী, তাড়াতাড়ি যাও। আমি আবার পরে ফোন করব,' বলে ফোনটা কেটে দেয় লীনা। তারপর ভাবে দাদীকে ওর ছয় মাসে একবার ফোন করা হয় কিনা সন্দেহ, আজ হঠাৎ দাদীকে ফোন করল কেন ও?

আদনানকে ড্রয়িং রুমে দেখে ঘরে ঢোকে লীনা। আদনান ওকে দেখে ধপ করে সোফায় বসে পড়ে, মুখে দুষ্ট দুষ্ট হাসি টেনে বলে, 'তোমাকে না দেখে চেক করতে এলাম, তিন বছরে আমার ওপর বিরক্ত হয়ে ভেগে গেছ কিনা।'

অন্য সময় হলে পি এইচ ডি ধারী লীনা এই সস্তা রসিকতায় দুম করে ক্ষেপে যেত। আজ সে আদনানের দুষ্টুমীটা অগ্রাহ্য করল, 'কেন, আমি ভেগে গেলে তোমার কোন বিশেষ সুবিধা হয়?'

'হয় বৈকি,' আয়েশ করে হাই তুলতে তুলতে বলে আদনান, 'একটা ব্র্যান্ড নিউ বৌ পেলে কে না খুশি হয়?'

ঠোঁটের কোণে সামান্য বিষাদময় হাসি দেখা যায় লীনার, ‘তুমি আমাকে নিয়ে খুশি নও তাইনা?’

সামনের দিকে ঝুঁকে বসে আদনান, যেন কোন গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে, ‘নাহ, তোমাকে নিয়ে খুশি না বললে সম্পূর্ন সত্য বলা হবেনা। তুমি একজন শিক্ষিতা, স্মার্ট, সুন্দরী, ভাল চাকুরী করা মেয়ে ...’

‘তাহলে কিসে আমার অপূর্ণতা?’, বিহ্বল কণ্ঠে সামাল দিতে পারেনা লীনা।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লীনাকে পর্যবেক্ষণ করে আদনান, ‘তুমি কি সত্যিই জানতে চাও?’

‘হ্যাঁ’।

‘তোমার ভাল লাগবেনা’।

‘না লাগুক, আমি আমাদের সংসার বাঁচাতে চাই’।

‘হাহ, সংসার!’, আদনানের তাচ্ছিল্যপূর্ণ হাসিতে চমকে ওঠে লীনা।

‘সরি, I did not mean it. শোন লীনা, আমরা বিয়ে করেছি, কিন্তু সংসার করেছি কি?’

‘মানে?’

‘সংসার করা মানে দু’জনে মিলে একটি গৃহ রচনা করা, ভাল মন্দ সবকিছু দু’জনে মিলে সিদ্ধান্ত নেয়া, দু’জনে মিলে নতুন অতিথিদের জন্য একটি সুন্দর পরিবেশ প্রস্তুত করা। আমরা কোনটি করতে পেরেছি বল তো?’

মুখ নীচু করে রাখে লীনা, ‘লীনা, আমি বলিনা তুমি ঘরে বসে অযথা তোমার মেধাকে নষ্ট হতে দাও, কিন্তু তোমার ক্যারিয়ারই যদি তোমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় তাহলে স্বভাবতই আমার মনে প্রশ্ন জাগে, ‘তাহলে তোমার জীবনে আমার স্থান কোথায়?’ তোমার সামান্য মাথাব্যাথা হলেও আমি কাজে যাইনা বা গেলেও তাড়াতাড়ি চলে আসি, যেহেতু তোমার ভাল থাকা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের বিয়ের ছ’মাস পর, তোমার চাকরীর সূত্র ধরে যখন আমরা এই বিদেশে চলে এলাম, এখানকার আবহাওয়া আমার সহ্য হোলনা, জ্বরে পড়ে কাতরালাম সাতদিন, তুমি ক’দিন ছুটি নিয়েছ বা এমনকি একদিন আধাদিন করে ঘরে ফিরে এসেছ বল তো লীনা?

তুমি আমার সেবা করতে বাধ্য নও, কিন্তু সামান্য মানবিক সহানুভূতি তো আমি আমার প্রাপ্য মনে করতে পারি!'

লীনা কিছু বলতে পারেনা, 'বন্ধুবান্ধব সবার জীবনে প্রয়োজন, জীবনে আনন্দফূর্তি করারও প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু সেটা নিত্যদিনের নিয়ম হয়ে যেতে পারেনা লীনা। সপ্তাহে কয়দিন আমরা বাসায় থাকি বল তো? কয়দিন আমরা বাসায় খাই? মনে করতে পারো কবে আমরা বাসাটাকে গৃহ বানানোর উদ্দেশ্যে সময় ব্যায় করেছি? তুমি জানো আমি খুব একটা সামাজিক নই। সামাজিক পরিবেশে আমি খেই হারিয়ে ফেলি। একদিন বাইরে কাটালে আমার দু'দিন লাগে সামলে নিতে। তাছাড়া যেহেতু সারাদিন আমরা দু'জন বাইরে থাকি, সন্ধ্যার পর সময়টুকু আমি চাই তোমার সাথে কাটাতে। কিন্তু তুমি কিছুতেই চাকচিক্যের মোহ কাটাতে পারোনা। কিন্তু লীনা, সুখ কি দামী শাড়ি, একেকদিন একেকরকম গহনা, ভাল রেস্টুরেন্টে খাওয়া আর অন্যকে খুশি করার জন্য দাঁত কেলিয়ে হাসায়, নাকি পরস্পরের সাহচর্যে?'

'তুমি আমাকে এসব কথা এতদিন বলনি কেন?'

'বলার চেষ্টা করেছি। প্রথম বছর যখন আমাদের বিবাহ বার্ষিকীতে আমি চাইলাম দু'জনে মিলে সমুদ্রের পাড়ে বসে সারাদিন গল্প করব, বালিতে পা ডুবিয়ে হাঁটব, সমুদ্রের ঢেউয়ের সাথে ছোঁয়াছুঁয়ি খেলব- মনে আছে তুমি কেমন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিলে? সেই ভয়েই তো প্রতিবছর অনুষ্ঠান করি যদিও এসব মেকি কাজকারবার আমার ভাল লাগেনা। আমাদের ভালবাসা কি জনসমক্ষে প্রদর্শনী দেয়ার জিনিস না মানুষের উপহারে পরিমাপ করার বস্তু? এটা অনুভব করার ব্যাপার। কিন্তু একেকটা অনুষ্ঠানে অনাকাঙ্খিত লোকজনের সান্নিধ্য আর চাকচিক্যময় পরিবেশ আমাকে এতটা ক্লান্ত করে দেয় যে বাসায় এসেও আমার আর তোমার সাথে সময় কাটানোর মত এনার্জি থাকেনা'।

'আমি দুঃখিত আদনান, ব্যাপারটা আমার বোঝা উচিত ছিল। তুমি কখনো আমাকে কোন বিষয়ে জোর করনি, কিন্তু আমি ভাবতেই পারিনা জোর করলে আমার কেমন লাগত'।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ। তারপর লীনা বলে, 'আদনান, তুমি কেন বলনি তুমি সন্তান চাও?'

'লীনা, একটি সন্তান একটি দম্পতিকে একটি পরিবারে রূপান্তরিত করে, একটি সন্তান একটি গৃহকে সংসার বানায়, একটি সন্তান একটি সম্পর্ককে পূর্ণতা দান করে। একজন নারী একজন

পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি উদগ্রীব থাকে সন্তানের জন্য, সাধারনত। গৃহের প্রতি তোমার আকর্ষন না থাকলে সন্তানের কথা তোমাকে বলি কি করে বল তো? সন্তান ধারণ কিংবা লালনপালনের যোগ্যতা তো আমার নেই। নইলে সেই কবে দু'চারটা 'ওয়্যাঁ ওয়্যাঁ' কোলে নিয়ে ঘুরতাম!'

আদনানের কথায় হেসে ফেলে লীনা। লীনাকে হাসতে দেখে স্বস্তি পায় আদনান। যাক, আজ সম্ভবত ঝগড়া হবেনা।

'আদনান, আধুনিক শিক্ষা আমাকে বানিয়েছে প্রতিযোগী মনোভাবাপন্ন, সংসারী হতে শেখায়নি। আমি জানি নেটওয়ার্কিং ছাড়া জীবনের ইঁদুর দৌড়ে এগিয়ে যাওয়া মুস্কিল, তাই আমি নেটওয়ার্ক তৈরী করতে করতে কবে যে তুমি আমার নেটওয়ার্কের বাইরে পড়ে গেছ দেখার সময়ই পাইনি! আর হ্যাঁ, আধুনিকতা আমাকে শিখিয়েছে জীবনের চাকচিক্যের প্রতি আকর্ষন অথচ জীবনের মূল লক্ষ্যগুলো কবে আমার প্রায়োরিটি লিস্ট থেকে ধীরে ধীরে কাটা পড়েছে লক্ষ্যই করা হয়নি!'

'আদনান, তুমি কেন আমাকে স্বেচ্ছাচারী হতে দিলে? কেন আমাকে টেনে ধরলে না? কেন আমাদের মাঝে নীরবতার দেয়াল তুলে দিয়ে আমাকে দূরে সরিয়ে দিলে?'

'ম্যাডাম, আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ। জীবনের কাছে আমার চাহিদা খুব কম। তুমি যদি মনে করতে এই মূর্খ গোঁয়াড় লোকটা তোমার জীবনটা ফানা ফানা করে দিল!'

'মনে করবনা, কিন্তু তুমিও আর আমাকে এভাবে দূরে সরিয়ে দেবেনা। ভুল করতে দেখলে হাত ধরে ফিরিয়ে আনবে', আদনানের ঘাড়ে মাথা গুঁজে আরাম করে বসে লীনা।

আদনান ওর মুখমন্ডল দু'হাতের মধ্যে স্থির করে ধরে পর্যবেক্ষণ করে, 'তুমি কে? তুমি আমার বৌকে কি করেছ?'

হেসে ফেলে লীনা, 'আমিই তোমার বৌ, কিন্তু আমার একজন ভাল ট্রেনার মিলেছে। তিনি আমাকে সংসারবিদ্যায় ট্রেনিং দিচ্ছেন'।

'কে তিনি?'

'এটা আমার সিক্রেট'।

‘আমার সাথে সিক্রেট!’, কপট মন খারাপ করে আদনান।

‘হুমম, যতদিন তুমি আমার সাথে দুরত্বের দেয়াল তুলে না দেবে বা আমি তা হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ভাংতে না পারি ততদিন এই সিক্রেট জানা যাবেনা’।

‘ওকে, চল তবে দু’জনে দু’দিক থেকে দেয়াল ভাঙ্গা শুরু করি!’

হাসতে হাসতে হাত ধরে উঠে দাঁড়ায় দু’জনে, একটি নতুন জীবন গড়ে তোলার সংকল্পে।

রেহনুমা বিনত আনিস

মুসলিম নারীদের কাজ "বাচ্চা জন্ম দেওয়া" এবং "স্বামীকে খুশি করা"?

মুসলিমাহ নারীদের কাজ **"বাচ্চা জন্ম দেওয়া"** এবং **"স্বামীকে খুশি করা"** বলতে শুনলেই আমাদের মুসলিমদের গায়ে যেন দাউদাউ করে আগুন জ্বলে যায়! কেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কি এটাই আমাদের প্রধান দায়িত্ব করে দেন নি? আল্লাহর তা'আলার ইবাদতের জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সত্যি কথা। কিন্তু একজন নারীর প্রধান দায়িত্ব কি??

যেই চারজন নারী জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে থাকবেন, যারা দুনিয়া ও আখিরাতে সবচেয়ে সম্মানিত, যাদের মর্যাদা পুরো পৃথিবীর সব নারীর মধ্যে সবচাইতে বেশি; তাঁরা এই অবস্থানে কেন আছেন??

কি করেছিলেন তাঁরা? কীভাবে আল্লাহর ইবাদত করেছেন যে তাদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে এতোটা বেড়ে গেছে??

এই চারজনের প্রত্যেকেই তাদের মা এবং স্ত্রী হবার কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই এই মর্যাদার উপযোগী হয়েছেন।

মারইয়াম (রা) হলেন সেরাদের সেরা। তিনি সমগ্র বিশ্বের নারীদের মাঝে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাকে নিয়ে কুর'আনে বলা হয়েছে -

"হে মারইয়াম, আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। আর তোমাকে বিশ্ব নারী সমাজের ঊর্ধ্বে মনোনীত করেছেন।" [সূরা আলে ইমরান: আয়াত ৪২]

এই মারইয়াম, আল্লাহর কাছে তাঁর সম্মান পেয়েছেন ঈসা (আ) এর মা হবার কারণে। একজন মা হওয়া অনেক বড়ো ব্যাপার। মা হবার কষ্ট, ধৈর্য্য, সন্তান লালন-পালন এবং সুসন্তান গড়ে তোলা বিশাল ব্যাপার, বিশাল! এই প্রতিটা কাজ আল্লাহর ইবাদতের অংশ। আর এভাবে ইবাদত করেই তিনি অর্জন করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থান।

দ্বিতীয় খাদিজা (রা)। নবীজি (সা) এর জন্য তিনি কতো ত্যাগস্বীকার করেছেন, পড়তে পড়তে চোখ দিয়ে পানি আসে। সত্যি বলবো, আমি জানি, আমি কোনদিন এতোটা করতে পারবো না নিজের স্বামীর জন্য। বরং আমরা তো অতি তুচ্ছ ব্যাপারেও ধৈর্য্যহারা হয়ে পড়ি।

তৃতীয় এবং চতুর্থ স্থানে আছেন আসিয়া ও ফাতিমা (রা)। দুজনের একজন মা এবং একজন স্ত্রী হিসেবে নিজের দায়িত্ব অত্যন্ত সুষ্ঠুরূপে পালন করেছেন।

এই চারজন নারীর কেউ-ই বাইরে পড়াশোনা করতে যান নি। ঘরের বাইরে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য-চাকরিবাকরি করতে যান নি। হ্যাঁ, আপনি বলবেন - ওগুলো তো হাজার বছর আগের কথা ছিল। এখন সময় বদলেছে, এখন নারী-পুরুষ সব সমান। সবাই ঘরের বাইরে যাওয়াই এখন স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে, দ্বীনের কিছু কন্সট্যান্ট বিষয় আছে। দ্বীনের এই ভিতগুলো যুগের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে যায় না। আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে সব যুগের উপযোগী করেই প্রেরণ করেছেন। এতে হেরফের করার কোন প্রয়োজন নেই।

আমরা সঠিক ইসলামের অনুসারী হলে জেনে থাকবো, আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের চূড়ান্ত সাফল্য কখোনোই এইসব দুনিয়াবি পড়াশোনা কিংবা ক্যারিয়ারের ওপর নির্ভর করে না। রিকশাওয়ালার গরিব বউটা, যে বাচ্চা আর সংসার ছাড়া কিছুই জানে না, সেও জান্নাতে এই লন্ডনে পড়া আমার চাইতে উপরে অবস্থান করতে পারে, শুধুমাত্র তার ঈমান, আমল, ও ইবাদতের জোরে। আমাদের শুনতে খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু সত্য শ্রুতিমধুর না হলেও বদলে যায় না।

বর্তমান সমাজে সম-অধিকারের জোয়ার এসেছে। মেয়েদেরকে পড়াশোনা করতে হবে। শুধু তাই নয়, আমাদেরকে ক্যারিয়ারিস্ট ও অ্যাম্বিশাস হতে হবে। এই ডিগ্রি নেওয়ার কারণই হলো যেন আমরা আমাদের ক্যারিয়ার নিশ্চিত করতে পারি। যেন দুনিয়াবি একটা পদমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। সমাজ বেধেই দিয়েছে মেয়েদের কাজগুলো কী কী। মেয়েদেরকে পুরুষের মত ঘর থেকে বের হয়ে অবশ্যই চাকরি-বাকরি করতে হবে। কোন নারী যদি নিজের ইচ্ছায় ঘরে বসে থাকে, যদি সে ভাবে "আমি এতো কষ্ট করে চাকরি করতে চাই না, শুধু সন্তানকে সময় দিতে চাই," তাহলে তাকে বাঁকা চোখে দেখা হবে। লোকের নজরে, সমাজের নজরে সে নিশ্চিতভাবেই নিচু বলে গণ্য হবে। আপনি এটাকে "অধিকার" বলেন? আমি বলবো, চাপিয়ে দেওয়া বোঝা। অত্যাচার। জুলুম। এভাবে নারীদেরকে এমন কিছু কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে যা তার স্বাভাবিক

প্রকৃতির সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিন্তু সমাজের বেধে দেওয়া স্ট্যান্ডার্ড বলে কথা! এবার পালাবি কোথায়? না চাইলেও এই বোঝা বয়ে বেড়াও। তা নাহলে "সম্মান" থাকবে না।

দুঃখজনক হলেও সত্যি, সম্মান আসলেই থাকে না। সম-অধিকারের কথা বলে ফেনা তোলা বুদ্ধিজীবিরা এমনভাবেই আমাদের জীবনের লক্ষ ও উদ্দেশ্যকে মেপে দিয়েছে। এই মাপের চুল পরিমাণ বাইরে গেলেই আমি গোঁড়া, অশিক্ষিত, গোয়ার, মূর্খ, সস্তা হাউজওয়াইফ। আমার চাইতে বাইরে সেজেগুজে কাজ করতে যাওয়া একজন নারীর সম্মান ও মর্যাদা সমাজের চোখে অনেক বেশি। কিন্তু আল্লাহর চোখেও কি তাই? ওয়াল্লাহি, আল্লাহর চোখে যদি তা হতো, তবে কখনোই ঐ চারজন নারী জান্নাতের সর্বোচ্চ আসনের অধিকারী হতেন না।

এবার একটু চিন্তা করে দেখি, কাদের থেকে এই বিকৃত চিন্তার সূচনা?? কারা আমাদেরকে এমন বিকৃত মানসিকতা উপহার(!) দিচ্ছে?

নিঃসন্দেহে ইসলামের বিপরীতে অবস্থিত কিছু মানুষের মগজ থেকে এসবের আগমন। যেই মগজে শয়তান দখল বসিয়ে ভিত্তিহীন কথা বের করে। আমি একবার এখানে এক feminist activist এর সাথে কথা বলেছিলাম। অমুসলিম এক মেয়ে। তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমরা অধিকার চাও ঠিক আছে। কার সমান অধিকার চাও? পুরুষের সমান??

হাস্যকর, একজন নারী হয়ে, নারীত্বকে বিলীন করে দিয়ে "পুরুষ জাত"এর সমান হওয়াটাই নাকি আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত!

তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমাদের গন্তব্য কী? ওদের গন্তব্য শেষ পর্যন্ত feminist কাউকে সরকারের উঁচু পদে বসানো। আমি বললাম, তাহলে সেটা কি একজন পুরুষের জন্য unfair হয়ে যায় না? আমরা নিশ্চয়ই জানি, নারী ও পুরুষ এক ধাচে চিন্তাভাবনা বা কাজকর্ম করে না। শারীরিক, মানসিক সবখানেই আমাদের কিছু পার্থক্য স্বাভাবিক ভাবেই আছে। তাহলে একজন ফেমিনিস্ট যখন আইন তৈরি করবে, স্বভাবতই তা হবে নারীদের পক্ষে এবং পুরুষের প্রকৃতি ও স্বভাবের বিপক্ষে। কারণ একজন মানুষের পক্ষে বিপরীত লিঙ্গকে ঠিক বিপরীত লিঙ্গের মত করে বোঝা সম্ভব নয়। ঠিক একই কারণে পুরুষদের তৈরি আইনও নারীদের জন্য যথাযথ হয় না। মেয়েটা একমত হয়েছিল।

কিন্তু তার কাছে কোন সমাধান ছিল না। আল্লাহর পরিচয় নিয়ে গাফেল কারো কাছ থেকে আমি সমাধান পাবার আশাও করি না। কিন্তু সুবহান আল্লাহ! আল্লাহ আমাদেরকে ইসলাম দিয়েছেন। প্রতিটা সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। আমাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট আইন তৈরি করে দিয়েছেন। নারীবাদ বা পুরুষতান্ত্রিক একপেশে আইন নয়, মহান রবের পক্ষ থেকে আগত আইন, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা এবং আমাদের সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত। এই মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব শিখিয়ে দিয়েছেন। তাই আল্লাহপ্রদত্ত দায়িত্বগুলো কখনোই আমাদের ওপর জুলুম, অন্যায়, unfair নয়। হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা নারীকে মাতৃত্ব ও স্ত্রীত্বের দায়িত্ব দিয়ে অসম্মানিত বা জুলুম করেন নি, বরং এই সমাজের নিয়মগুলোই জুলুম। আপনি বুঝতে পারছেন না, আপনার কাছে ইসলামের সমাধানটা যুগের অনুপযোগী মনে হচ্ছে, আপনার চিন্তার সীমাবদ্ধতার কারণে। খোলা মনে আলোচনায় বসুন, জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাথে কথা বলুন, আপনার সংশয়-সন্দেহ দূর হবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা আজকে ইসলামের আদর্শ থেকে হয়ত কয়েক আলোকবর্ষ দূরে পড়ে আছি। আমরা পড়াশুনা কমপ্লিট করার জন্য বিবাহের মত প্রয়োজনীয় ইবাদত পালন করতে দেরী করি, চাকরি করার জন্য জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পিল ব্যবহার করি! সুবহান আল্লাহ! মা হবার মর্যাদাকে আমরা এতো সহজে উপেক্ষা করে ফেলছি। ক্যারিয়ার নিশ্চিত করতে আজ আমরা স্বামীকে সময় দেওয়ার ফুসরত পাই না। হায়! কোথায় মারইয়াম, খাদিজা, ফাতিমা, কোথায় আমরা! অথচ আমরাই "নারীদের পড়াশুনার বিপরীতে" কেউ কিছু বললে ধেয়ে যাই। তাকে পারলে সেখানেই ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলি। তাকে বুঝাতে যাই, খাদিজাও তো ব্যবসা করেছিল, হুম! অথচ আমরা ভুলে যাই, খাদিজা ব্যবসা করার জন্যে বাড়ির বাইরে পা রাখেন নি। আমরা মনে রাখতে চাই না, খাদিজা, মারইমায়, আসিয়া, ফাতিমাদের জীবনের অন্যান্য দিকগুলো! আমরা এভাবে ভাবি না যে, উনারা তো সেক্যুলার পড়াশুনাও করেন নি, তবে আমরা কেন ফিতনা মাথায় নিয়েও সেক্যুলার পড়াশোনা ও চাকরি-বাকরি করবো?

এবার একটু চিন্তা করে দেখুন, কেন আমরা "সেক্যুলার শিক্ষা"র বিপরীতে যুক্তি শুনলে এতো খেপা? কেন স্ত্রী হবার কথা, বাচ্চা নেবার কথা আসলেই আমাদের মুখ চুপসে যায়? কেন আল্লাহর দেওয়া নারীদের ঘরের ভেতরে থাকার নির্দেশটা আমাদের চোখে পড়ে না?

এর কারণ আমরা আসলে ইসলামকে দেখি কাফেরদের লেন্স থেকে। তারা যেভাবে দেখাতে চায়, সেভাবে। কাফের ভার্সনের একটা মডারেট ইসলাম তৈরি হয়েছে। সেখানে ইসলামের লেবাস

জড়িয়ে জাহেলিয়াত পালন করা যায়। আমরা জেনে না জেনে সেটাই করি। কাফেররা আমাদেরকে ফেমিনিজম শেখাতে চেয়েছে, তারা সফল। আমাদেরকে ক্যারিয়ারিস্ট করতে চেয়েছে, সেখানেও আমরা ধোঁকা খেয়ে বসে আছি।

আজকে সমাজে সম-অধিকারের জয়জয়কার। নারীবাদের দাপটে টেকা দায়! তাই আমি অবশ্যই মনে করি, নারীদের ব্যাপারে ইসলামের সঠিক শিক্ষা, সাহাবীদের ঐতিহ্য ও জান্নাতী রমণীদের জীবন থেকে মানুষকে বোঝানো দরকার খুবই বেশি। এই দায়িত্ব শুধু আলেমদের নয়, এই দায়িত্ব আপনার-আমার-সবার। এই পুরো পোস্টটি লেখার কারণ একজন মাওলানার ভিডিও। যিনি উত্তম ভাষাশৈলী ব্যবহার না করলেও মূলত উপরের বক্তব্যই দিতে চেয়েছেন। এই আলেমকে আমি চিনি না, কোনদিন নামটাও শুনি নি, আর আমি তার অনুসারীও নই। কিন্তু আল্লাহর শপথ, আমি এই আলেমের চাইতে তাদেরকে অনেক বেশি ভয়াবহ ও ইসলামের শত্রু মনে করি, যারা ইসলামের সত্যিকার শিক্ষাকেই বদলে দিচ্ছে। যারা ক্রমাগত কাফেরদের চিন্তাচেতনায় প্রভাবিত হচ্ছে। যারা সমাজের বুদ্ধিজীবিদের এজেন্ডা পালনের জন্যই ইসলামকে ব্যবহার করে চলেছে, জেনে কিংবা না-জেনে।

কই আমরা তো তাদের দিকে তেড়ে যাচ্ছি না। আসলে তারা এতোটাই সূক্ষ্মভাবে আমাদের মন ও মগজকে কব্জা করে ফেলেছে যে, আমরা তাদের চালগুলো ধরতেই পারিনা। কিন্তু প্রভাবিত আমরা নিঃসন্দেহে হয়েছি। আর তাই তো, সেক্যুলার লেখাপড়া বাদ দেবার কথা শুনলে আমাদের মাথা গরম হয়ে যায়। কিন্তু ঘরে বসে স্ত্রীর দায়িত্ব পালন করার কথায় আমরা ইতস্তত করি। তখন আর একমত হতে পারি না যে ইসলাম নারীদের বাইরে যাওয়া অপছন্দ করে। তখন আমাদের চুলকানি শুরু হয়। বাচ্চা পেছানোর কথা উঠলে আমরা তো নির্বিকার। এগুলো যেন কোন সমস্যাই না! নিকাব পরে অনেকের মুখেই শুনি - তুমি কেন নিকাব পরো, এটা কি ফরয? অথচ সেক্যুলার পড়াশোনা একটা মুবাহ বা ঐচ্ছিক কাজ। সেটা নিয়ে কিন্তু আমাদের মনে এতো প্রশ্ন নেই। আমরা আসলে কোন বিষয়টাকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিচ্ছি? আল্লাহর ইবাদত, নাকি সমাজের রীতিনীতি? শেষ পর্যন্ত, আমরা আসলে ঐ ইসলামের নামে দুই নৌকায় পা দিয়েই চলছি। জাহেলিয়াতের বীজ এখনো আমাদের মাথায় গেঁড়ে আছে বলেই ইসলামের শিক্ষা মেনে নিতে আমাদের গা কুটকুট করে।

আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াত দিক! আমাদেরকে জাহেলিয়াত থেকে মুক্তি দিক, আমীন।

আমি নিজে সেক্যুলার এডুকেশন নিয়ে পড়ে আছি। আমি হয়ত স্বামীর মন জয় করতে পারছি না, কিন্তু তারপরেও আজ এই বড় বড় কথাগুলো বললাম। নিজের দুর্বলতার কারণে যেন সত্য প্রকাশে আমরা কুণ্ঠিত না হই। সবার কাছে দু'আ চাই যেন সমাজের বেড়াজাল থেকে নিজের চিন্তাচেতনাকে মুক্ত করতে পারি, যেন ইসলামের আলোয় নিজেকে আলোকিত করতে পারি। আমি একজন বিবাহিত নারী। সুতরাং স্ত্রী এবং মা হিসেবে আমার সাফল্যেই আমার দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য নিহিত। এই কথাটা আমরা সব মুসলিমাহ যত তাড়াতাড়ি বুঝবো, ততোই মঙ্গল।

সবাই আমার জন্য দু'আ করবেন যেন নেক স্ত্রী ও নেক সন্তানদের মা হতে পারি। জাযাকুমুল্লাহু খাইর।

আনিকা ওয়ার্দা তুবা

আমাদের ঘর কি ইসলামি ঘর?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন, "আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের ঘরে বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন..." [১]

প্রশ্নটা হয়তো শুনতে কিছুটা অদ্ভুত লাগতে পারে। অনেকে হয়তো শোনা মাত্রই বলে বসবেন, "আমার বাড়ি অবশ্যই ইসলামিক বাড়ি!! আমরা মুসলিম পরিবার, কাজেই আমাদের বাড়ি পুরোপুরি ইসলামিক!!" আসলেই কি? নিচে দেওয়া ছোট্ট চেকলিস্টের সাথে মিলিয়ে দেখুন তো আসলেই আপনার বাড়ি ইসলামিক কি না?

১. আমি একজন ধার্মিক জীবনসঙ্গী বেছে নিয়েছি

ধার্মিক ও ন্যায়নিষ্ঠ জীবনসঙ্গীর ব্যাপারে অনেক হাদীসেই গুরুত্বের সঙ্গে বলা হয়েছে। কেন বলা হয়েছে সেটাও স্পষ্ট: সাধারণ জীবনসঙ্গীদের তুলনায় একজন ধার্মিক জীবনসঙ্গী সংসারে অধিক সুখ ও পরিতৃপ্তির পরিবেশ গড়ে তুলতে পারবে। স্ত্রী ধার্মিক হলে অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে পারবে। ধার্মিক স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে গড়ে তুলতে পারবে একটি ন্যায়নিষ্ঠ ও ধার্মিক পরিবার। আর এটাই ইসলামিক বাড়ির মূল ভিত্তি।

২. আমি আমার জীবনসঙ্গীকে সাহায্য করি

প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন, দুজনের মধ্যে মমতা ও ভালোবাসার বন্ধনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক একটি পরিবার। অন্যান্য আধ্যাত্মিক ব্যাপারগুলোতে পরস্পরকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার মাধ্যমে এই সহযোগিতা আরও বিস্তৃত হতে থাকে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ঈমান বাড়ানোর জন্য সংগ্রাম করা; 'ইবাদাহ্‌র প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া; প্রয়োজন হলে শুধরে দেওয়া; কুর'আন তিলাওয়াত করতে উৎসাহিত করা; তাহাজ্জুদ সলাত পড়া; দান করা; ইসলামি বই, ম্যাগাজিন পড়া; ধার্মিক বন্ধু বাছাই করতে সাহায্য করা; ভালো কাজের আদেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ করতে নিষেধ করা। ঈমান এমন এক জিনিস যা কখনো বাড়ে, কখনো কমে। কাজেই নিজেদের ঈমান বাড়ানোর প্রতি যেমন খেয়াল রাখতে হবে, তেমনি খেয়াল রাখতে হবে আমাদের জীবনসঙ্গীদের ঈমানও যেন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৩. আমাদের বাড়ি আল্লাহর যিক্‌রের স্থান

বহু উপায়ে আল্লাহর যিক্‌র করা যায়: মনে মনে, নির্দিষ্ট কিছু যিক্‌র পাঠ করে, সলাতের মাধ্যমে, কুর'আন আবৃত্তি করে, আযকার মুখস্থ করে, ইসলামিক ইস্যু আলোচনার মাধ্যমে কিংবা ইসলামিক বিভিন্ন বিষয় পড়ে পড়ে। ফেরেশতারা যেন আল্লাহর বারাকা নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে সেজন্য নিয়মিত ঘরে এ ধরনের যিক্‌র হওয়া প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, "যে-ঘরে আল্লাহর স্মরণ করা হয় আর যে ঘরে স্মরণ করা হয় না, তাদের তুলনা হচ্ছে যেন একটি জীবিত আর অপরটি মৃত।" [২]

৪. আমাদের ঘর 'ইবাদাতের ঘর

অর্থাৎ যথাযথ সময়ে আমাদের ঘরে সলাত আদায় করা হয়। আর যখন পরিবারের একাধিক সদস্য উপস্থিত থাকে, তখন সবাই একসাথে জামা'আত-বদ্ধ হয়ে সলাত আদায় করে।

কেউ কেউ তাদের বাসায় সলাত আদায়ের জন্য আলাদা একটা ঘরও রাখতে পারেন। বিশেষ করে খেয়াল রাখবেন সেই ঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাতন্ত্র্য যেন বজায় থাকে। নারীদের জন্য সলাত বাসায় পড়াই উত্তম। আর পুরুষদের জন্য বাধ্যতামূলক সালাতগুলো মাসজিদে আদায়ের পর, ঐচ্ছিক সালাতগুলো বাসায় পড়তে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "অন্যের সাথে পড়ার চেয়ে বাসায় ঐচ্ছিক সলাত পড়া উত্তম; ফার্দ সলাত যেমন একা একা না পড়ে জামা'আত-বদ্ধভাবে পড়া উত্তম।"[৩] এটা এজন্য যে, যাতে মাসজিদের মতো বাসাও 'ইবাদাতের স্থান হিসেবে পরিগণিত হয়।

৫. শয়তানকে দূরে রাখার জন্য আমরা নিয়মিত সূরাহ আল-বাক্বারাহ ও আয়াতুল-কুরসি তিলাওয়াত করি

আল্লাহর বার্তাবাহক বলেছেন, "তোমাদের বাড়িতে সূরাহ আল-বাক্বারাহ তিলাওয়াত করো। কেননা, যে বাড়িতে সূরাহ আল-বাক্বারাহ তিলাওয়াত করা হয় শয়তান সেই বাড়িতে প্রবেশ করে না।"[৪] তিনি আরও বলেছেন, "যখন তোমরা বিছানায় [ঘুমাতে] যাবে তখন আয়াতুল-কুরসি পাঠ করো: 'আল্লাহ! তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর'—এই আয়াতের শেষ পর্যন্ত। এই আয়াত তিলাওয়াতের ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য একজন অভিভাবক নিযুক্ত করা হবে, আর সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে ঘেঁষতে পারবে না।[৫]

৬. পড়াশোনা আমাদের ঘরের এক চলমান প্রক্রিয়া

এই দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে ঘরের মূল কর্তার। তাকে নিশ্চিত করতে হবে যে, তিনি তার পরিবারকে সঠিক পথে চালিত করছেন: ভালো কাজের আদেশ দিচ্ছেন, মন্দ কাজে নিষেধ করছেন। পরিবারের সব সদস্যের উপর জ্ঞান অর্জন অত্যাবশ্যক। জ্ঞানের ভিত্তিতেই সতেজ হয়ে ওঠে ঈমান। ইসলামের বুনিয়াদি বিষয় সম্পর্কে অবহিত সদস্যদের দিয়ে একটি পাঠচক্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখান থেকে পরিবারের সব সদস্য উপকৃত হতে পারবে। এসব পাঠচক্রে অংশগ্রহণের জন্য শিশুদের বিশেষভাবে উৎসাহ দিতে হবে। তাতে করে তারা এতে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে এবং ভবিষ্যতে তাদের জীবনেও তারা এর বাস্তবায়ন করবে।

৭. আমাদের ঘরে ইসলামিক লাইব্রেরি আছে

এসব লাইব্রেরিতে স্থান পেতে পারে বই, ইসলামি ক্যাসেট ও সিডি। পরিবারের সদস্যরা যেন উপকৃত হতে পারে সেজন্য এসব বই ও সিডির বিষয়বস্তুগুলো সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হওয়া জরুরি। বইপত্র ও সিডির সংগ্রহ বৈচিত্রময় হওয়া উচিত। এতে করে পরিবারে ছোট সদস্য থেকে শুরু করে বড়রাও লাইব্রেরি থেকে পছন্দমাফিক বই বা সিডি বাছাই করে নিতে পারবে। পরিবারের সদস্যদের উপযোগী বিভিন্ন ভাষার বই/সিডি রাখা যেতে পারে। আরবি বই বা সিডি তো অবশ্যই থাকতে হবে। পরিবারের সদস্যদের কুর'আনের ভাষা জানতে হবে। না জানলে শেখার প্রক্রিয়ায় থাকতে হবে। আর বইগুলো হতে পারে বিভিন্ন বিষয়ের উপর। সহজেই যেন বিষয়মাফিক বই খুঁজে পাওয়া এ জন্য ঠিকমতো সাজিয়ে রাখতে হবে। সিডিগুলো হতে পারে কুর'আন তিলাওয়াতের উপর, ইসলামি লেকচার, খুতবা, ছোট শিশুদের জন্য দু'আমূলক ও আদবকায়দা শেখানোর সিডি, নাশীদ (বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছাড়া ইসলামিক গান) ইত্যাদি। পরিবারের সদস্যদের একে অপরকে প্রতিনিয়ত এসব বই ও সিডি ব্যবহার করতে উৎসাহ দিতে হবে। অন্যান্য যেসব মুসলিম পরিবারে এগুলো প্রয়োজন তাদের সাথে এসব বই ও সিডি শেয়ার করতে হবে।

৮. নাবি মুহাম্মাদের মতো নৈতিকতা ও আদব বজায় রাখার চেষ্টা করি

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কোনো বাসার লোকদের প্রতি আল্লাহ যখন ভালো কিছু ইচ্ছে করেন তখন তিনি তাদের মধ্যে দয়া ছড়িয়ে দেন।"[৬] তিনি আরও বলেছেন, "আল্লাহ দয়াশীলতাকে ভালোবাসেন। দয়াশীলতাকে আল্লাহ এমনভাবে পুরস্কৃত করেন যেমনটা আর কিছুর জন্য করেন না।"[৭] নাবি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দয়া, মানুষের সঙ্গে তার

সদাচরণের অসংখ্য উদাহরণ ছড়িয়ে আছে যেগুলো আমরা অনুকরণের চেষ্টা করতে পারি। স্ত্রীদের প্রতি তাঁর ছিল গভীর ভালোবাসা। বাচ্চাদের সঙ্গে তিনি প্রায়ই খেলতেন। ঘরের কাজে স্ত্রীদের সাহায্য করার জন্য প্রায়ই তিনি তাদের সাহায্য করতেন। এভাবে তাঁর উদাহরণ অনুসরণ করে আমরা আমাদের বাসাকে পরিণত করতে পারি শান্তির নীড়ে।

৯. বাসাসংক্রান্ত ইসলামিক বিধানগুলো আমরা জানি

যেমন ঘরের গোপন কথা বাইরে না বলা, ঘরে প্রবেশের আগে অনুমতি নেওয়া, অন্যের বাড়িতে উঁকিঝুঁকি না দেওয়া, দিনের নির্দিষ্ট কিছু সময়ে বাবা-মা'র বিছানার ঘরে সন্তানদের প্রবেশ করতে না দেওয়া এবং রাতে একাকী বাইরে না-থাকা। শেষেরটি খুবই কৌতূহলউদ্দীপক কেননা, অনেক স্বামীকে ব্যবসা কিংবা কাজের জন্য মাঝেমধ্যে বাড়ির বাইরে থাকতে হতে পারে। কিন্তু রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতে নিরুৎসাহিত করেছেন। ইব্‌ন 'উমার থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একা থাকতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, রাতে যেন কেউ একা না থাকে কিংবা একাকী ভ্রমণে না বের হয়। [৮] একা একা রাতে থাকলে সে তো একা থাকবেই, তার স্ত্রী-বাচ্চারাও কোনো নিরাপত্তা ছাড়াই বা সঙ্গীবিহীনভাবে একা পড়ে থাকবে।

১০. আমরা আমাদের ঘরে ধার্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করি

"আমার প্রভু! আমাকে ও আমার বাবা-মাকে ক্ষমা করুন। এবং বিশ্বাসী হিসেবে আমার ঘরে যে প্রবেশ করে তাকেও ক্ষমা করুন। আরও ক্ষমা করুন সব বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীদের।" [৯] ঘরে ন্যায়নিষ্ঠ মানুষদের নিয়মিত উপস্থিতি ও তাদের সাথে কথোপকথন প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনে। এ ধরনের মানুষেরা কল্যাণকর বিষয়েই বেশি কথা বলবে। কল্যাণকর জ্ঞান ও তথ্যের জন্য তারা হতে পারেন অনন্য উৎস। আমাদের সবসময় এই দু'আ করা উচিত আল্লাহ যেন আমাদের ন্যায়নিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব দিয়ে অনুগ্রহ করেন। নাবি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কেবল বিশ্বাসীদের সাথে সাহচার্য রাখবে। ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কেউ যেন তোমার খাবার না খায়।" [১০]

১১. আমাদের ঘরে মন্দ কিছু নেই

আমাদের ঘরে কোনো টেলিভিশন নেই, কোনো হারাম বাদ্যবাজনা আমাদের ঘরে বাজে না। (শিক্ষামূলক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ঘরে টেলিভিশন থাকতে পারে।) ঘরের দেওয়ালে টাঙানো

ছবিগুলোতে কোনো প্রাণীর ছবি নেই। মূর্তি কিংবা ভাস্কর্যের মতো কিছু ঘরে নেই। ঘরে কুকুর নেই, ধূমপান নিষিদ্ধ। অতিরিক্ত আড়ম্বর এড়াতে আমাদের ঘরের সাজসজ্জা খুবই সাধারণ। শুধু ভালো কাজেই টেলিফোন কিংবা মোবাইল ব্যবহৃত হয়; পরনিন্দা বা পরচর্চার উদ্দেশ্যে নয়। কেউ বেরাতে এলে, পুরুষ ও নারীদের জন্য রয়েছে আলাদা আলাদা বসার ব্যবস্থা। উপরোক্ত জিনিসগুলো ঠিকঠাক রাখা না হলে তার খারাপ প্রভাব বাড়ির উপর পড়বেই। উদাহরণস্বরূপ, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ঘরে ছবি টাঙানো থাকে কিংবা কুকুর থাকে ফেরেশতারা সেই ঘরে প্রবেশ করে না।" [১১]

১২. আমাদের বাড়ির অবস্থানও ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা পালনে সহায়ক

বাসা যদি মাসজিদের আশেপাশে হয় তাহলে বাড়ির পুরুষদের জন্য মাসজিদে সলাত পড়তে খুব সুবিধা। মাসজিদে যদি নিয়মিত হালাকা, কুর'আন শিক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রম চলে তাহলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও এতে সহজেই যোগ দিতে পারবে। বাসা এমন জায়গায় নিতে হবে যেন আশেপাশেও মুসলিম পরিবার থাকে। নিকট প্রতিবেশীদের ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে; পাপপরায়ণ প্রতিবেশী থেকে দূরে থাকতে হবে। বাসা নেওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে নারী ও পুরুষদের জন্য যেন আলাদা বসার ব্যবস্থা থাকে। বাড়ি হতে হবে প্রশস্ত। নিরাপত্তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা যেন থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। স্বাস্থ্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।

আপনার স্কোর কত?

উপরের দেওয়া ১২টি পয়েন্টের সাথে মিলিয়ে দেখুন আপনার স্কোর কত?

১০-১২: অভিনন্দন। আপনার ঘর প্রকৃত অর্থেই ইসলামিক ঘর। সঠিক পথেই আছেন আপনি।

৭-৯: ভালো। তবে আপনার ঘরকে প্রকৃত ইসলামি ঘর হিসেবে গড়ে তুলতে আরও একটু কাজ করতে হবে। আল্লাহর সাহায্যে সেই কাজটা তেমন কঠিন হবে না।

৪-৬: খারাপ। আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার লাভের জন্য আপনাকে ও আপনার পরিবারকে অনেক কাজ করতে হবে। পরিবারের অনেক দিক বদলানোর দিকে নজর দিতে হবে।

০-৩: খুব খারাপ। খুব বড় ধরনের পরিবর্তন দরকার আপনার ঘরকে ইসলামি ঘর হিসেবে রূপান্তরিত করার জন্য।

[১] সূরাহ আন-নাহ্‌ল, ১৬:৮০

[২] মুসলিম

[৩] স়াহীহ় আল-জামি

[৪] স়াহীহ় আল-জামি

[৫] বুখারি

[৬] আহ়মাদ, স়াহীহ় আল-জামি

[৭] মুসলিম

[৮] আহ়মাদ

[৯] সূরাহ নূহ, ৭১:২৮

[১০] আবূ দাঊদ, আত-তিরমিযী

[১১] বুখারি

মূল: ড. আইশা হামদান

অনুবাদ: মাস‘ঊদ শারীফ

islam21c.com থেকে অনূদিত

সন্তানদের 'মানুষ' করা

বান্ধবী শিমু বলত বিয়ের পর সে ছেলের মা হতে চায় যেন সে দেখিয়ে দিতে পারে ছেলেদের কত ভালোভাবে মানুষ করা যায়। অন্যরা বলত তারা মেয়ে সন্তান চায় কারণ মেয়েরা বাবামাকে জ্বালায় না।আর আমি বলতাম আমি বিয়েই করবনা! কিন্তু অদৃষ্টের লিখন যায় না খন্ডন। বিয়ে হোল। বাচ্চাও হোল। তখন বাচ্চা "মানুষ" করার প্রশ্নও এলো।

এক্ষেত্রে আমার তিনটা বিশেষ সুবিধা ছিল।

প্রথমত, আমার অভিজ্ঞতা। ছোট ভাই দু'টি যথাক্রমে আমার ছয় এবং বারো বছরের ছোট ছিল। বিশেষ করে বিদেশে থাকায় ছোটটির প্রায় সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে বারো বছর বয়স থেকেই মাতৃত্বের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার সুযোগ হয়েছে। তাছাড়া বাবা অল্প বয়সে বিয়ে করাতে বাবার বন্ধুদের ছেলেমেয়েরাও ছিল আমার অনেক অনেক ছোট। তাঁরা বিভিন্ন সময় আমার কাছে বাচ্চা রেখে যেতেন, এতে করে বিভিন্ন ধরণের শিশুদের দেখার এবং নিয়ন্ত্রণ করার অভ্যাস হয়ে গেছিল অল্প বয়সেই।

দ্বিতীয়ত, আমি সর্বভূক। ছোটবেলা থেকেই যেখানে যা পেতাম, বুঝি না বুঝি, পড়তাম। পরে এই টুকরো টুকরো তথ্যগুলো অনেক কাজে লেগে যায়।

তৃতীয়ত, আমার বাবামার পাশাপাশি অন্যান্যদের বাবামাকে পর্যবেক্ষণ করে অনেক কিছু শেখার এবং বোঝার সুযোগ পেয়েছি।

আমি খুব ভালো মা নই। আদর্শ মায়েদের মত সন্তানদের খাওয়া দাওয়া, পোশাক আশাক নিয়ে আদিখ্যেতা আমাকে দিয়ে হয়না, প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার ব্যাপারেও আমার বাচ্চাদের ওপর কোন জোর নেই। তবে ছোটবেলা থেকেই তাদের আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব করিয়ে দিয়েছি। পড়তে শেখার সাথে সাথে হাতে অর্থসহ কুর'আন ধরিয়ে দিয়েছি।

তাদের বলেছি, "তোমাদের আমাকে বা আব্বুকে বা আর কাউকে খুশী করার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হতে পারেন এমন কোন কাজ তোমরা কখনো কোরনা। তোমরা যদি লুকিয়ে কিছু কর আমি দেখবনা, আব্বু দেখবেনা, হয়ত কেউই দেখবেনা, কিন্তু

আল্লাহ দেখবেন। তাহলে আল্লাহ তোমাদের আগুনে শিক কাবাব বানাবেন। আর ওনার কথা শুনলে তোমরা যা চাও সব উনি তোমাদের দেবেন"।

আমি চাইনা আমার সন্তানেরা রূপকথা শিখুক। আ্মাদের অধিকাংশেই ইসলাম সম্পর্কে ধারণা রূপকথার মতই। বিভিন্নজনের কাছে টুকটাক শোনা বা চটিবই পড়াতেই আমাদের ধর্মীয় জ্ঞান সীমাবদ্ধ। ফলে আমাদের মধ্যে জন্ম নেয় নানানরকম ভুল ধারণা, অনেক ভুল আচরণ। আসলে যে কি করতে বলা হয়েছে, কি মানা করা হয়েছে বা কেন এ'ব্যাপারে আমাদের স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। তাই আমরা নামসর্বস্ব মুসলিম হিসেবে বেড়ে উঠি। কুর'আনের কোন অংশ শুনলে "নিজের যুক্তি" দিয়ে বিচার করি। অথচ আমাদের মানদন্ড হওয়া উচিত কুর'আন এবং "যুক্তি" হওয়া উচিত সেই মানদন্ডের প্রেক্ষিতে। তাই আমি চাই ওরা নিজে পড়ে জেনে বুঝে "মানুষ" হোক। তাছাড়া এই বইটিতে যেভাবে আদর্শ আচরণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা যদি কোন মানুষ অনুসরণ করে তবে সে শ্রেষ্ঠ সন্তান, বাবা বা মা, বন্ধু, প্রতিবেশী, মালিক বা কর্মচারী সবই হতে পারবে। ব্যাস, আমার কাজ হয়ে গেল!

আমি যখন জানলাম তিনমাস বয়স থেকে গর্ভস্থ শিশুর হৃৎপিন্ড চালু হয়ে যায় এবং পাঁচমাস বয়স থেকে সে শুনতে পায় তখন একটা প্ল্যান করলাম। তিনমাসের সময় চুপি চুপি পড়ার পরিবর্তে জোরেজোরে কুর'আন হাদ্দিস বইপত্র পড়তে শুরু করলাম, রাগ কমিয়ে হাসিখুশী থাকার চেষ্টা করতে শুরু করলাম, মানুষের সাথে আরো বেশী ভালো আচরণ করতে শুরু করলাম। পাঁচমাসের সময় আমি আমার সন্তানদের সাথে কথা বলতে শুরু করতাম, ভালো খারাপ বোঝাতাম। অনেকে এটাকে পাগলামী মনে করে। কিন্তু একটা সাধারন পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন এতে পাগলামীর কিছু নেই। ভূমিষ্ঠ হবার পর শিশু তার বাবাকে দেখে পিটপিট করে তাকায়, তার গলার স্বরে সাড়া দেয়। সে কি করে বোঝে এটা তার বাবা? কারণ সে আগে থেকেই বাবাকে চেনে!

আমি আমার সন্তানদের সাথে তাদের জন্মের সাথে সাথেই কথাবার্তা চালিয়ে যেতাম। Baby talk না, adult talk. তাদের রূপকথার গল্প না বলে বিভিন্ন নবীরাসূল এবং বড়বড় মানুষের কথা বলতাম। আমার ননদরা হাসত। একদিনের বাচ্চাকে গল্প বলে! কিন্তু আমার মেয়ে আড়াই বছর বয়সে সবাইকে বুঝিয়ে দিল যে সে সব শোনে এবং বোঝে যখন ওর বাবা ওকে দুষ্টুমী করে বল্ল, "যাও, তুমি গোসল করে আস, তোমাকে কোরবানী দেব"। সে বল্ল, "আব্বু, আপনি কিছু জানেন না। শুধু ইব্রাহীম (আ) ইসমাইল(আ) কে কোরবানী করতে পারে। অন্য আব্বুরা শুধু গরুছাগল কোরবানী করতে পারে!"

আমার এক বোন কর্ণেলিয়া আজ ফেসবুকে লিখেছেঃ "Jasmine was in a forbidden relationship with Aladin, Snow White lived alone with seven men, Pinocchio was a liar, Robin Hood was a thief, Tarzan walked without clothes on, a stranger kissed Sleeping Beauty and she married him, Cinderella lied and sneaked out at night to attend a party. These are the stories our families raised us with and then they complain our present generation is messed up!"

আমরা আমাদের সন্তানদের যে আদর্শ দিয়ে বড় করব তাই তো তারা শিখবে!

অনেক আহ্লাদী মায়েরা তাদের সন্তানদের ছোটবেলায় শাসন করতে চান না। বলেন, "ও তো এখনো ছোট, বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে"। কিন্তু ছোটবেলা থেকে একটা শিশুকে ন্যায়-অন্যায়ের মানদন্ড যদি বাবামা না শেখায় তবে সে "ঠিক" হবে কি করে?

একটা শিশু অন্যদের সাথে খেলনা শেয়ার করতে চাইবেনা, অন্যের ঘরের জিনিসপত্র ভাংচুর করবে, রাত বারোটা বাজে কমলা খাবার আহ্লাদ করবে আর আমি মিষ্টি হাসি দিয়ে বলব, "ছোটবাচ্চা, ঠিক হয়ে যাবে?- কক্ষনো নয়!

আমার মেয়ের যখন দেড়বছর, সে বারবার রান্নাঘরে আগুনে হাত দিতে চাইত। এই অবস্থা দেখে আমি একদিন একহাতে বরফ নিলাম, আরেক হাতে একটা ম্যাচ জ্বালিয়ে তাকে ধরার সুযোগ দিলাম। সে ম্যাচ ধরে কেঁদে ওঠার সাথে সাথে হাতে বরফ ঠেঁসে দিলাম। ফোস্কাও পড়লোনা, হাতও পুড়লোনা- বড়জোর কিছুক্ষণ জ্বালা করল। কিন্তু সে বুঝে গেল আগুন দেখতে সুন্দর কিন্তু তা ধরলে হাত পুড়ে যায়। আর কোনদিন তাকে নিয়ে আমার ভাবতে হয়নি। মাঝে মাঝে বিপদের কাছাকাছি যেতে দিয়ে শিশুকে সচেতনতা শেখানো যায়। এতে সে বৃহত্তর বিপদ থেকে রক্ষা পায়। Responsibility এমন একটা জিনিস যা আমার মনে হয় সবাইকে ছোটবেলা থেকেই শেখানো উচিত।

একইভাবে এটাও নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন যে আমাদের শিশুরা টিভিতে কি দেখছে। সারাদিন টিভিতে নাঙ্গা নাচ চলছে আর শিশু বাবামা'র সাথে বসে তাই দেখছে, এই শিশুর লজ্জাবোধ তো ওখানেই শহীদ হয়ে যাচ্ছে! এক ভাই রাহাত আজ লিখলঃ "Almost 70 of the Tom and Jerry cartoon shows that Tom is extensively addicted to the opposite sex. And he reacts strangely when he sees anyone of the opposite sex. Guardians are not weary of what it represents but the kids are watching this very

easily with family!” শিশুকে যে ধরণের রুচি দিয়ে বড় করা হবে তাই শিশুর ভালো মনে হবে। যেমন আমরা যখন ছোট ছিলাম বাবা ভালো ছবি বেছে আমাদের দেখাত, সাথে বসে বুঝিয়ে দিত। আমার মেয়ে ছোটবেলা থেকে Peace TV দেখে অভ্যস্ত। ক্যানাডায় Peace TV নেই বলে সে নিজেই কম্পিউটারে Peace TV বের করে দেখে।

সবচেয়ে বড় কথা আমাদের নিজেদের সংশোধন করতে হবে। আমাদের এটা বোঝা প্রয়োজন যে আমরা শিশুদের কি বলি তার চেয়েও ওরা অনুসরণ করে আমরা কি করি। প্রত্যেক শিশুই মনে করে তার পিতামাতা আদর্শ।

সুতরাং, আমরা কোন অন্যায় করলে তখন তারা মনে করে, “বাহ, আব্বু যেহেতু মিথ্যা কথা বলে, আমি বললেও নিশ্চয়ই কোন অসুবিধা নেই!” এটা খুব জরুরী যেন বাবামা সন্তানদের সামনে ঝগড়া না করেন বা পরস্পরের বা তাদের পরিবারের ব্যাপারে কোন বাজে মন্তব্য না করেন। কারণ একটা শিশু নিজেকে মূল্যায়ন করে তার বাবামায়ের মাধ্যমে। তার যদি নিজের বাবামা’র প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নষ্ট হয়ে যায় তবে সে নিজেও low self esteemএ ভুগতে শুরু করে। এ’ একই কারণে আমাদের এমন অন্যায় করা উচিত নয় যা আমরা চাই না আমাদের সন্তান করুক যদিও সেটা আমরা মনে করি আমার সন্তানের সুখের জন্য। যেমন, আমার আয়-রোজগার কম হবার কারণে যদি আমার সন্তান একবেলা না খেয়েও থাকে তাতে তার সামান্য ক্ষুধা ছাড়া আর কোন কষ্ট হবেনা। কিন্তু যদি আমি সুদঘুষের টাকায় আমার সন্তানকে একটি ভালো জীবন দেয়ার চেষ্টা করি তাতে তার ক্ষতি বই কোন লাভ হবেনা। সে টাকার মূল্য বুঝবেনা, শ্রমের মূল্য শিখবেনা এবং এই টাকা তাকে পৃথিবীর জৌলুসের প্রতি আকৃষ্ট করে মূল জিনিসগুলো থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে, ফলে সুখ তার কাছে কখনোই ধরা দেবেনা। উপরন্তু, আল্লাহ বলেছেন যার শরীরে একবিন্দু পরিমাণ হারাম প্রবেশ করবে সে কোনদিন জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। সুতরাং, কার্যত এতে করে আমি আমার সন্তানকে কেবল দুনিয়াতেই নয় বরং আখেরাতেও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেব।

আমি আমার সন্তানদের সাধারন মানুষ হিসেবেই বড় করতে চাই। তারা আমার সাথে মাটিতে শুয়ে ঘুমাতে ভালোবাসে। ওরা কোনদিন ওদের বাবামাকে অতিরিক্ত দামী জামাকাপড় পরতে দেখেনি, তাই যখন ওদের জন্য হকার্স মার্কেট থেকে কাপড় কেনা হয় তখন ওদের আঁতে ঘা লাগার মত কিছু ঘটেনা।

ওদের ছোটবেলা থেকে needs এবং wantsএর তফাত করতে শেখানোর চেষ্টা করেছি। “চাহিবামাত্র দিতে বাধ্য থাকিবে” কথাটা ওরা কোনদি্ন শোনেনি। যখন ওরা কিছু চায় তখন ওদের চিন্তা করার সুযোগ দেই আসলে এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ বা এর পরিবর্তে অন্য কিছু দিলে কেমন হয়। যেমন আমি আমার সন্তানদের শেখানোর চেষ্টা করি তারা যেন নিজেদের মেধা, গুন, ব্যবহারের মাধ্যমে সুপরিচিত হবার চেষ্টা করে। আমি আমার মেয়েকে সামান্য পয়সার লিপ্সটিক কিনে দেইনি কোনদিন, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী দাম দিয়ে মাইক্রোস্কোপ কিনে দিয়েছি। কেননা লিপ্সটিক তাকে সৌন্দর্যপ্রদর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করে তাকে লোভী পুরুষদের দৃষ্টির খোরাকে পরিণত করবে, কিন্তু মাইক্রোস্কোপের ভেতর দিয়ে দেখা আরেকটা জগত তার অন্তঃর্দৃষ্টিকে প্রসারিত করবে।

আমার বাবার কাছ থেকে আমি দু’টো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস শিখেছি। বাবা যথাসম্ভব পরিবারকে সময় দিত এবং সবার সাথে এমন বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করত যে আমাদের কখনো মনে হয়নি এ’কথাটা বাবাকে বলা যাবেনা বা এটা লুকানো দরকার।

সন্তান যখন মনে করে যে সে তার পরিবারের কাছ থেকে যথেষ্ট ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব পাচ্ছে তখন সে বাইরে ভালোবাসা খুঁজতে যাবার প্রয়োজন বোধ করেনা। সুতরাং, তার সুযোগসন্ধানী কারো হাতে পড়ে জীবনটা এলোমেলো করে ফেলার সম্ভাবনা থাকে কম। পাশাপাশি সে যদি মনে করে বাবামায়ের সাথে সব কথা বলা যায় তাহলে সে কোন বিপদে পড়লে বা কাউকে ভালো লাগলে নির্দ্বিধায় বলতে পারবে- ফলে বাবামা উত্তম পরামর্শ দিয়ে তাকে সহযোগিতা করতে পারবেন। অন্তত একজন অভিভাবকের এই দায়িত্বটা পালন করা উচিত যাতে সন্তান পিতামাতার কাছ থেকে নিজেকে distant মনে না করে, তার মনে না হয় তার পরামর্শ করা উচিত বন্ধুদের সাথে (বন্ধুদের জ্ঞানবুদ্ধি আর বাবামায়ের অভিজ্ঞতা ও বিবেচনার মধ্যে কি কোন তুলনা হয়?), সে নিজেকে চাপযুক্ত মনে না করে এবং সে বাধ্য হয়ে নয়, খুশী হয়ে বাবামায়ের আদেশ উপদেশ শোনে। পারিবারিক সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য খেলাধুলার বিকল্প নেই। আমরা বাবার সাথে স্ক্র্যাবল, মনোপলি, ফ্রিসবি থেকে শুরু করে লুডো পর্যন্ত খেলতাম- এখনো সময় পেলে খেলি। আরেকটা ব্যাপার হোল গল্পসল্প করা, ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলা, পছন্দ অপছন্দ আলাপ করা যাতে উভয়ে পরস্পরের মনমানসিকতা বুঝতে পারে এবং মনোমালিন্য এড়িয়ে চলতে পারে।

ছোটবেলায়, যখন পুরোপুরি সব কথা বুঝতামনা তখন বিচিত্রায় একটা জরীপ পড়েছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর (লুকিয়ে লুকিয়ে অবশ্যই!)। এতে বলা হয়েছিল, যারা দূরবর্তী অঞ্চল

থেকে এখানে পড়তে আসে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারাই নানাপ্রকার প্রেমঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে যেহেতু দীর্ঘদিন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে তাদের মন প্রায়ই খারাপ থাকে। আমার সেই ছোট্ট মাথায় তখন এটাই এসেছিল, এত লেখাপড়া করে কি হবে যদি একটা মানুষ তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, তার চরিত্রই হারিয়ে ফেলে? একটা মানুষের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা মাস্টার্স হওয়াটাই কি জীবনের মূল লক্ষ্য? সবার আগে কি তার একজন ভালো মানুষ হবার চেষ্টা করা উচিত নয়?

এখন বড় হয়েছি (মনে হয়, যদিও মনটা এখনো ছোটদের মতই রয়ে গেল এবং সেভাবেই তাকে রাখতে চাই)। এখন বুঝি মানুষের সঠিক বয়সে বিয়ে করা উচিত। এটা লেখাপড়া বা আর কোন ব্যাপারে প্রতিবন্ধক নয়। জীবনে কোন কিছুকে আর কোনকিছুর জন্য ঠেকিয়ে রেখে দেয়াটা একটা চরম বোকামী। মানুষের রয়েছে অসীম সম্ভাবনা আর প্রচন্ড চাপ নেবার ক্ষমতা যদি সে নিজের মনোবলকে উন্নীত করতে পারে। তাই মানুষ বিয়ে, সন্তান, সংসার, লেখাপড়া, চাকরী সব একসাথে চালাতে পারে যদি বাবামা সহযোগিতাপূর্ণ হন। আমাদের বাবামাদের উচিত সন্তানের পার্থিব উন্নতির পাশাপাশি তাদের পারলৌকিক জীবনে ঠেকে না যাওয়া নিশ্চিত করার জন্য তাদের সময়মত বিয়ে দেয়া। আমরা বিয়ে নামক সামাজিক অনুষ্ঠানে নানারকম বিদ'আত যোগ করে একে একপ্রকার বিভিষিকায় রূপান্তরিত করে ফেলেছি। অথচ এগুলো বাদ দিলে এটা খুব একটা কঠিন কিছু নয়। ধরুন আমার বিয়ে। বাবা হাফিজ সাহেবকে বল্লু, "তোমার নতুন চাকরী, এখন গোল্ড দেয়া জরুরী নয়। পরে তুমি যখন পারো তখন তুমি তোমার বৌকে ইচ্ছেমত কিনে দিয়ো"। হাফিজ সাহেব বললেন, "আমি যৌতুক নেবনা, দিলে বিয়েই করবনা"। আমি বললাম, "গায়ে হলুদ বিদ'আত, সুতরাং গায়ে হলুদ করা, বাড়ীতে বা বিয়ে বাড়ীতে লাইট লাগানো যাবেনা। বরং ঐ পরিমাণ টাকা তুমি কোন গরীব মেয়ের বিয়ে দিতে খরচ কোর। এতে হয়ত আমাদের বিয়েতে আল্লাহ বরকত দেবেন"। ব্যাস, অল্প সংখ্যক আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব খাইয়ে, এক অনুষ্ঠানে বিয়ে হয়ে গেল! হাফিজ সাহেব ওনার বাবার একমাত্র ছেলে আর আমি বাবার একমাত্র মেয়ে। দুই পরিবারেরই সামর্থ্য ছিল জাঁকজমক করে বিয়ের অনুষ্ঠান করার। কিন্তু আমরা আনন্দিত যে আমরা আমাদের বাবামাকে আমাদের বিয়ে উপলক্ষ্যে কোন কষ্ট ভোগ করতে দেইনি।

আবার অনেক সময় মানুষের বিয়ে করতে দেরী হয়ে যায় "প্যাকেট" খুঁজতে খুঁজতে। ছেলে কি করে, মেয়ে দেখতে ঐশ্বর্য রাইয়ের চেয়ে সুন্দরী কি'না। যেই criteria দেখে বিয়ে করা প্রয়োজন সেগুলো নিগৃহিত হয়।

ফলে কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হয় সমস্যা। হয় তালাক, নয় অশান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান, নইলে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় পরস্পরের সাথে অবস্থান করেও চারিত্রিকভাবে বিচ্যুত হয়ে পড়া। বাবামাকে নির্বাচন করতে হবে মানুষ দেখে, সন্তানকেও এ'ব্যাপারে বাবামাকে উৎসাহিত করতে হবে যে মানুষ কেমন এটাই তার মূল লক্ষ্য এবং যদি এর জন্য তাকে কিছু ছাড় দিতে হয় তাতে সে অনুৎসাহী নয়। সবচেয়ে বড় কথা আমি এখন থেকেই আমার সন্তানদের জন্য দুআ করি যেন আল্লাহ তাদের জন্য সর্বোত্তম সঙ্গী মিলিয়ে দেন এবং আমাদের মনকে তাদের জন্য এমনভাবে উন্মুক্ত করে দেন যাতে আমরা তাদের নিজেদের সন্তান থেকে পৃথকভাবে না দেখি।

সবচেয়ে বড় যে অন্যায়টি আমরা নিজের সন্তানের সাথে করি তা হোল তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা। পক্ষপাতিত্ব যার বিরুদ্ধে করা হয় তার চেয়েও বেশী ক্ষতি করা হয় সে সন্তানটির যার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়। সাধারনত এহেন আচরণের পেছনে বাবা বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মায়ের একটা সুপ্ত উদ্দেশ্য থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে মা এই সন্তানটিকে ব্যাবহার করেন কারো বিরুদ্ধে- সেটা হতে পারে তাঁর স্বামী, শ্বাশুড়ী বা ছেলের বৌ। কখনো সন্তানের ভক্তি তাকে এই সন্তানের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল করে তোলে। কিন্তু সেই সন্তানটি যখন বুঝতে পারে যে সে ব্যবহৃত হবার বিনিময়ে কিছু বিশেষ সুবিধা আদায় করতে পারে বা কোন অন্যায় করেও scot free বেঁচে যেতে পারে, তখন সেও এই special status উপভোগ করতে শুরু করে। কিন্তু কার্যত এতে সে লেখাপড়া ফাঁকি দিতে শুরু করে, কাজের প্রতি নিস্পৃহ হয়ে পড়ে, পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে, নির্লজ্জ ও স্বার্থপর হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত পরিবারের সবার বিরক্তির কারণ হিসেবে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একজন পিতা বা মাতা সন্তানের এর চেয়ে বড় আর কি ক্ষতি করতে পারেন? এক্ষেত্রে পিতামাতার পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সন্তান লালন করা, সন্তানকে নিজেদের মধ্যে power playর গুটি না বানানো এবং নিজেদের মধ্যকার সমস্যা সন্তানকে বুঝতে না দেয়া অত্যন্ত জরুরী।

চারপাশে দেখছি, শিখছি, ভুল করছি আবার সংশোধন করছি। সন্তানের সাথে প্রতিটি মুহূর্তই তো আসলে এক নতুন অভিজ্ঞতা কারণ প্রতিটি শিশু আলাদা স্বভাবচরিত্র নিয়ে জন্মায়, প্রত্যেককে পর্যবেক্ষণ করে তাকে বোঝার চেষ্টা করতে হয়, তারপর তাকে কিভাবে বোঝানো যায় তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। আমার অসংখ্য ছাত্রছাত্রীদের দেখে এবং তাদের সহযোগিতা করতে গিয়ে শেখার সুযোগ পেয়েছি অনেক, আমি কৃতজ্ঞ। চেষ্টা করছি ছেলেমেয়েদের আমার বোধ অনুযায়ী সন্দর মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার। সবাই দুআ করবেন যেন সবাই সন্তানদের সর্বাগ্রে উত্তম মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারি।

রেহনুমা বিনতে আনিস

সৎ এবং সাহসী মানুষ

১।

জোন অফ আর্ক, ইখতিয়ারুদ্দিন মুহাম্মাদ বখতিয়ার খিলজি, উসামা বিন জায়েদ- এরা ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে জন্মেছে এবং বেড়ে উঠেছে। কিন্ত এদের মাঝে রয়েছে এক বিরল সাদৃশ্য। এরা প্রত্যেকেই জাতির সংকটময় মূহূর্তে নিজ নিজ সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে অকল্পনীয় পরিস্থিতির ভেতর বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। এদের আরেকটা মিল হোল ওরা সবাই ছিল টিনেজার- early teenager. অথচ তাদের বোঝার ক্ষমতা, মেধা, যোগ্যতা, দায়িত্বশীলতা ছিল অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ এবং পরিপক্ক লোকজনকে পরিচালনা করার জন্য যথেষ্ট। আজ পৃথিবীর কোথাও কি আমরা এমন একজন টিনেজার খুঁজে বের করতে পারব?

আমাদের টিনেজারদের দোষ নয়- তাদের বাবারা কলের ইঁদুরের মত টাকার পেছনে ছুটছেন, পরিবারকে এনে দিচ্ছেন সকলপ্রকার ধনসম্পদ প্রাচুর্য সম্ভার কিন্তু সন্তানের গঠনপ্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহণ করার সময় নেই; মায়েরা স্বাভাবিকভাবেই অনুভূতিপ্রবণ এবং সন্তানের কল্যাণকামী, কিন্তু স্বামীর অনুপস্থিতিতে সন্তানকে আগলে রাখার প্রবণতা বেড়ে এমন এক পর্যায়ে চলে যায় যা তাকে পঙ্গু করে ফেলার জন্য যথেষ্ট। আর স্বামী যখন সর্বদাই অনুপস্থিত তখন মায়ের এই অতিরিক্ত protectiveness সন্তানকে কি জোন অফ আর্ক বা বখতিয়ার খিলজি বানাবে না ভিডিও গেমে পুরো পৃথিবীকে কুপোকাত করে ফেললেও বাস্তব পরিস্থিতিতে অকেজো করে ফেলবে তা সহজেই অনুমেয়।

২।

মিশরের প্রবল পরাক্রমশালী বাদশাহ ফেরাউন, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনীর মহান অধিপতি, ধনৈশ্বর্য্যের কোন ঘাটতি নেই তার রাজ্যে, চারিদিকে গড়ে উঠছে বিশাল বিশাল পিরামিড তার নিজের এবং পুর্বপুরুষদের ক্ষমতার দম্ভের স্তম্ভ হিসেবে, রাজপ্রাসাদে উপচে পড়ছে সুখের সমস্ত আয়োজন- কিন্তু সে সুখি নয়, কারণ সারা পৃথিবী স্ত্রীর পদতলে উজার করে দিলেও তার স্ত্রীর কাছে তার ক্ষমতা এবং অহংকারের কোন মূল্য নেই। স্ত্রী আসিয়া তাকে মুখের ওপরেই বলে- এই ক্ষমতার উৎস অত্যাচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত, এই প্রাসাদ আর পিরামিড দরিদ্রের অধিকার কেড়ে নিয়ে গড়ে তোলা, সে এর কোন অংশই চায়না, সে ফেরাউনকে দেবতা বলেও স্বীকার

করেনা বরং সে আল্লাহর কাছে জান্নাতে একটি ঘর চায়। চূর্ণবিচূর্ণ অহংকারে, রাগে, ক্ষোভে ফেরাউন প্রিয়তমা স্ত্রীকে ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে চুবিয়ে মারে। আসিয়া একে ফেরাউনের সাথে বসবাসের চেয়ে শ্রেয় মনে করে মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করে নেয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে এমন প্রতিবাদী এবং জীবনের প্রতি নির্মোহ মহিলা আজকে ক'জন পাওয়া যাবে?

আজকের নারী অপরিচিত পুরুষের মুখে সামান্য একটু প্রশংসা শোনার জন্য নির্দ্বিধায় পোশাক খুলে ফেলছে, সামান্য ক'টা টাকার জন্য বিকিয়ে দিচ্ছে নিজের সর্বস্ব, বাবা মা মেয়েকে মডেল বা অভিনেত্রী পরিচয় দিতে পেরে গর্বে বুক ফুলে ফেটে পড়ছেন- তারা কি জানেন না এর জন্য তাদের সন্তানটিকে কি কি করতে হচ্ছে? আজ একটা মেয়ের স্বপ্ন হয় ছোট্ট একটা ঘর, ছোট্ট একটা গাড়ী, স্বামীর ভাল চাকরী, ছোট্ট সুখের সংসার- হায়! ক'জন স্বপ্ন দেখে জান্নাতে একটি বাড়ীর?

৩।

বিখ্যাত সেনা কমান্ডার হ্যানিবলকে যখন খবর দেয়া হোল সামনে আল্পস পর্বত, এর ওপর দিয়ে কিছুতেই হাতি পার করা যাবেনা, তিনি বললেন, 'I will either find a way or make one'.

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলতেন, 'Impossible is a word to be found only in the dictionary of fools'.

তারিক বিন জিয়াদ অনিচ্ছুক সৈন্যদের ফিরে যাওয়ার পথ রোধ করার জন্য জাহাজ জ্বালিয়ে দিয়ে তাদের বললেন, '

We now have the enemy in front of us and the deep sea behind us. We cannot return to our homes, because we have burnt our boats. We shall now either defeat the enemy and win or die a coward's death by drowning in the sea. Who will follow me?'

আজকের যুদ্ধটা একটু অন্যরকম।

সৎভাবে উপার্জন করার কথা বললে একজন পুরুষ বলেন, 'তাহলে আমার সংসার চলবে কি করে?'

জীবিকা এবং পরিবারের মাঝে সময় বন্টন করে দেয়ার কথা বললে বলেন, 'দিনটা মোটে ২৪ ঘন্টার, এর মধ্যে এত কিছু কি করে ম্যানেজ করা সম্ভব?'

অন্যায় avoid করার জন্য চাকরী পরিবর্তন করার কথা বললে আঁতকে ওঠেন, 'এই দুর্মূল্যের বাজারে চাকরী ছাড়লে আবার চাকরী পাবার নিশ্চয়তা কি?

তাদের একবারও কি মনে আসে, সন্তানকে অন্যায়ের ভিত্তির ওপর খাইয়ে পরিয়ে বড় করলে সে সৎ এবং সাহসী মানুষ হবে তার নিশ্চয়তা কি?

৪।

একজন মুহাম্মাদ, যেদিন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন সেদিন অসম্ভব ভয় পেয়ে গেলেন, নিজের ওপরেই আস্থা হারিয়ে ফেললেন। তখন একজন খাদিজা তাকে আশ্বস্ত করলেন, একজন সৎ ব্যাক্তিকে কোন অন্যায় স্পর্শ করতে পারেনা, এবং জগতশ্রেষ্ঠা চার নারীর একজন হয়ে গেলেন। একজন আবু বকর দৃঢ়চিত্ত রইলেন, যে কোনদিন মিথ্যা বলেনি সে চল্লিশ বছর বয়সে মিথ্যা বলা শুরু করতে পারেনা তা তার কথাবার্তা যতই অবিশ্বাস্য শোনাক না কেন। একজন কিশোর আলী নেতৃস্থানীয় লোকদের পাহাড়প্রমাণ তাচ্ছিল্যের সামনে বুক চিতিয়ে বলল, 'আপনার পাশে আর কেউ না থাকলেও আমি আছি'। একজন উমার সত্যের স্পর্শে এক মূহূর্তে ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠল। এভাবে একজন একজন মানুষ এক একটি বিশেষ মূহূর্তে এগিয়ে এসে সারিবদ্ধ হয়ে একটি সম্পূর্ন পৃথিবীতে পরিবর্তনের ঢেউ ছড়িয়ে দিল। এভাবেই এক একজন মানুষ শুধু নিজের দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে ভাবার মাধ্যমেও পুরো পৃথিবীর পরিবর্তন ঘটাতে পারে। প্রশ্ন হোল আমরা ব্যাক্তি হিসেবে নিজের দায়িত্বের কথা ভাবছি কিনা।

৫।

পরিবারে সবার বড় ছিলাম। যুদ্ধের ময়দানে সম্মুখসমরে অভ্যস্ত। তাই পরিস্থিতি যতই প্রতিকুল হোক, নৈরাশ্যবাদের বিলাসিতার সুযোগ হয়নি কখনো, রঙ্গিন চশমাও আঁটা হয়নি চোখে। জীবনকে দেখি প্রখর বাস্তবতার স্পষ্ট আলোয়।

আজকের পৃথিবীতে সৎ নেতার অভাব, সাহসী লোকের অভাব- নেতারা জনগণকে বিনোদনের রঙ্গিন চশমা পরিয়ে আচ্ছন্ন করে রাখে যেন সে সুযোগে তারা ইচ্ছেমত করতে পারে, তারা কখনোই চাইবেনা সমাজের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাক, কারণ তখন সবাই তাদের পর্যবেক্ষণ

করার সুযোগ পাবে; সংসারের ঘানিটানা জনগণের মাঝে জেগে ওঠার সাহসের অভাব, স্বপ্ন দেখার সাহসের অভাব, যদি স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়, তার চেয়ে কল্পনার রঙ্গিন জগতে বসবাস করা সহজতর!

কিন্তু আসল অভাবটা অন্য জায়গায়। একটি সমাজ অনেকগুলো পরিবারের সমষ্টি। এই পরিবারকে গড়ে তোলেন একজোড়া পিতামাতা। একজন পিতা তার সন্তানকে শেখাবেন কিভাবে মাছ ধরতে হয়, কিভাবে শিকার করতে হয়, কিভাবে নদীতে সাঁতার দিতে হয়, কিভাবে নৌকা বাইতে হয়, কিভাবে গাড়ী চালাতে হয়, কিভাবে চাষ করতে হয়, কিভাবে বাজার করতে হয়, কিভাবে নিজের পরিবারকে নিরাপদ রাখতে হয়- এই দায়িত্বগুলো একজন মাকে দিয়ে হয়না। বাবা যদি সময় দিতে ব্যার্থ হন তখন সন্তানের পৌরুষসূচক গুণাবলীতে ঘাটতি রয়েই যায়। একজন মা সন্তানকে শেখাবেন আদবকায়দা, ভদ্রতা, কোমলতা, গৃহের প্রতি দায়িত্ব, পরিবারের সদস্যদের প্রতি সদাচরন এবং তিনিই সন্তানকে শেখাবেন একবার পড়ে গেলে কিভাবে আবার উঠে দাঁড়াতে। মা যদি সময় বা সাহস দিতে ব্যার্থ হন তখন এই সন্তান যতই আদরযত্নে বেড়ে উঠুক না কেন তার এই দিকগুলো বিকশিত হবার সুযোগ পায়না।

আজকের ছেলেমেয়েরা বড় হয় ফার্মের মুরগীর মত করে- ফার্মের মুরগীর মতই তাদের কেবল দেহটা বাড়ে, কিন্তু তাদের বোধবুদ্ধিতে প্রসার ঘটেনা। ফলে এরা বড় হয়ে চাকরীবাকরী করে খেয়েপরে চলতে পারে, এর বেশি আর কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য তাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়না। এদের দিয়ে সমাজপরিবর্তন তো দূরে থাক, সমাজের উপকার হবারও কোন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়না। তাই আজকাল একটি কিশোর তার ফ্লাস্ক থেকে ভিক্ষুকের গ্লাসে পানি ঢেলে দিচ্ছে দেখলে আমরা আপ্লুত হই, কেউ রাস্তায় টাকা পেয়ে মালিককে ফিরিয়ে দিলে অবাক হই, কেউ শালীনভাবে চললে তার প্রশংসা করি- আমাদের মাথায় এটা আসেনা যে এগুলো তো স্বাভাবিক মানবিকতার সর্বনিম্ন পর্যায়! অথচ পৃথিবীব্যাপী মানুষ পশুবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পন করছে; সামান্য ক'টা টাকার জন্য আমাদের আশেপাশেই মানুষ খুনজখম স্মাগলিং রাহাজানি ছিনতাই করছে; মানুষ মানুষকে মেরে ফেলছে, মাতৃগর্ভে শিশু পর্যন্ত রেহাই পাচ্ছেনা- আর আমরা কি করছি? আমরা পেপার পড়ে মুখে 'চু চু' শব্দ করছি, নতুবা টিভিতে এই বীভৎসতা দেখে চ্যানেল পরিবর্তন করে দিচ্ছি, চায়ের কাপে ঝড় তুলে নাচগানের অনুষ্ঠানে ডুবে যাচ্ছি। ব্যাস, আমাদের দায়িত্ব শেষ! তাই ভাবি, পৃথিবীতে হয়ত এখন আর সৎ এবং সাহসী মানুষজন জন্মায়না- তাদের ধারণ করার মত মা এখন আর নেই, তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করার মত বাবা এখন আর নেই, তাদের গ্রহণ করার মত সমাজ এখন আর নেই, তাদের মূল্যায়ন করার মত নেতৃত্ব এখন আর নেই। এটা নৈরাশ্যের কথা নয়, এটাই বাস্তবতা।

রেহনুমা বিনত আনিস